আপনার এই উক্তি প্রবল করিয়া ঔরঙ্গজেবের দরবারে দণ্ডায়মান যশোবন্ত সিংহের মতই ক্ষুব্ধ লজ্জায় রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া বলিতেন, "স্তব্ধ হও মীরজুম্‌লা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তখন বন্য শৃগাল তার মধ্যে আসে কি হিসাবে?"

তার পর ঘোষাল মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভক্ত সাধককেও রামকৃষ্ণ হৃদয় ভরিয়া ভালবাসিতেন, তন্মধ্যে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর কথা উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যাহা হউক, ইহাও ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি যখন কিশোরবয়স্ক বালক, তখন একজন যুবক আমার মাথায় ঘটনাক্রমে এমন একটা ভাব ঢুকাইয়া দিয়াছেন যে, আমি চেষ্টা করিয়াও উহা ভুলিতে পারিলাম না। ঘটনাটি এই—

একবার * * রে কয়েকজন উৎসাহী যুবক একত্র হইয়া "রামকৃষ্ণোৎসবের" অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি-পূজা হইতেছে, এমন সময় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মজা দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি যে ভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চতুর্দ্দিকে অসহায় করুণার দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, তাহা আমার এখনও বেশ মনে আছে। ক্রমে মনোভাব চাপিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, পার্শ্বে দণ্ডায়মান কয়েকজন কলেজের ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "যে পরমহংস মশাইকে তোমরা আজ পূজা করিতেছ, উনি তো ব্রাহ্মই ছিলেন। ব্রাহ্মভক্তদের কত ভালবাসিতেন— সর্ব্বদা তাহাদের সহিত মিশিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতেন; সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কৃপায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া শেষ-জীবনে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, অথচ এ সব কথা গোপন করিয়া কতকগুলি লোক তাঁহাকে অবতাররূপে খাড়া করিয়া সাধারণের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতেছে।"

এইরূপ হিতকথা ও সাধু উপদেশে আচার্য্য মহাশয় যুবকগণকে সত্যপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় একজন যুবক তাঁহার প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি করি মহাশয়, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক; শাস্ত্র, মহাপুরুষ, অবতার এ সব বিশ্বাস করি। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দুষ্কৃতকে বিনাশ ও সাধুদের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকি। পরমহংসদেব ব্রাহ্মসমাজে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়াছিলেন, তাই অনেক উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী-ব্রাহ্মকে সদুপদেশ দিয়া পথে আনিতে চেষ্টা করিতেন; করুণাপরবশ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। তিনি যে পতিতপাবন, পতিত দেখিলে কি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন?"

যুবকের এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না, পাঠক বিবেচনা করিয়া

দেখিবেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন কোন ব্রাহ্মভক্তকে যে রামকৃষ্ণ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতারপ্রভাবে, না আর কিছুর জন্য ?

রামকৃষ্ণের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাবের বহর দেখাইয়াই ঘোষাল মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই; বিবেকানন্দের মধ্যেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব দেখিয়াছেন; যে হেতু, তিনি "জ্ঞানযোগ" নামক পুস্তকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং সেবাক্ষেত্রে খৃষ্টীয় কর্ম্মের ভাব আনয়ন করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল। মন্তব্য অনাবশ্যক। আমেন!

কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য আছে, যাহা খাইতে গেলেই চাট্‌নীর প্রয়োজন, অন্যথায় গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মও তাহাই। পরনিন্দার চাট্‌নী ব্যতীত উহা ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণের মুখরোচক হয় না। প্রচার-কার্য্যে পরিপক্ক ঘোষাল মহাশয় তাই সঙ্গত সভার সভ্যবৃন্দকে যুগধর্ম্মের সহিত ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিন্দা ও সাধু-নিন্দার চাট্‌নী পরিবেশন করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে ঘোষাল মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা ও আদর্শ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তব্য। উহা পাঠ করিতে করিতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবি বাবুর একটি গল্প মনে পড়িল। মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রের ঘরে একটি নরকঙ্কাল টাঙ্গানো থাকিত। একদিন রাত্রে ছাত্রটি দেখে, কঙ্কাল সজীব হইয়া যেন তাহাকে বলিতেছে,—'এই যে আমার ললাটের নিম্নে দুইটি কোটর দেখিতেছ, উহার মধ্যে দুইটি মনোহর চক্ষু ছিল। তাহার উপরে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ একজোড়া বাঁকা ভ্রূ ছিল—নীচে রক্তিম নিটোল গণ্ডদ্বয় আপেলের মতই টক্‌-টক্ করিত। এই লম্বমান হাড়গুলি একদিন নবনীত-কোমল ভুজবল্লীরূপে দুলিয়া দুলিয়া কত যুবকের মনে তপ্ত লালসা জাগাইয়া তুলিত। এই কঙ্কালের উপর কত লাবণ্য, কত রূপ, কত কমনীয়তা ছিল। অর্থাৎ আমাকে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র অস্থিসমষ্টি বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, অতীতকালে আমি একজন পরমা সুন্দরী রমণী ছিলাম। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

প্রচারক মহাশয় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, "রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা ও প্রচারের ফলে এ দেশে এ ধর্ম্ম জমাট বাঁধিয়াছে।" আমার কিন্তু মনে হয়, ঘোষাল মহাশয়-শ্রেণীর প্রচারকগণের এই প্রকার,—কি আর বলিব,—জন্যই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ এই দশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। কে বলিবে, ইহা ব্রাহ্মসমাজের দশম দশা কি, না? জমাট বাঁধা কি দশম দশার পরিচয়?

বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ।—সাহিত্য-তপোবনের কণ্টক আমরা, উনবিংশ শতাব্দীর একটা ভ্রান্ত আদর্শের সংঘাত-জনিত কর্কশ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তপোবনের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় বাঙ্গলার চারিদিক্ হইতে কি দারুণ হাহাকারের তপ্ত শ্বাস আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী অনেক দিন হইতেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনমতে জীবনধারণের জন্য, অতি কায়-ক্লেশে যে একমুষ্টি অন্ন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে আজ তাহাও জুটিতেছে না। বাঙ্গালায় আজ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে গৃহে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; পুড়িতেছে—পুড়িবে, মরিতেছে—মরিবে। সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইয়া যাইবে! কোটি কোটি বাঙ্গালী আজ ক্ষুধার তাড়নায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—ঊর্দ্ধে—নিম্নে—চারিদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতেছে,- কে তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিবে? খাইতে না পাইলে যে মানুষ বাঁচে না! ইহারা কাহার দুয়ারে গিয়া হাত পাতিবে? রাজদ্বারে? শ্মশানে? কোথায় যাইবে?

অমাবস্যার নিশীথিনী,—অন্ধকারে স্তব্ধ,—এ শ্মশানে কে জাগে? একটা জাতি বহুদিন খাইতে না পাইয়া, যে জীর্ণ কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া আসিতেছিল, আজ আর সে তাহাও পারে না। অস্থিচর্ম্মসার কোটি কোটি কঙ্কাল পড়িয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে, পতিপুত্রকে কোনরকমে আধপেটা খাওয়াইয়া ঘরে ঘরে বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীরা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া চক্ষের জল আঁচলে মুছিতেছে,—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না, কেহ দেখিতেছে না,—কেহ জানিতেছে না,—দিনে দিনে শুকাইয়া মরিতেছে। এ শ্মশানে কেহ জাগে? কেহ জাগে না? একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না? বলিবে অদৃষ্ট? কে গড়িয়াছে? কেহ কি ভাঙিতে পারে না? বলিবে, তাহা ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। কেহ কি গড়িতে পারে না?

বহুদিন বাঙ্গলায় মানুষ জন্মে নাই। কিন্তু আর ত দেরী সহ্য হইবে না। এ যে যায় যায়। আকাশের উপর যদি ঈশ্বর থাক, বাঙ্গলা দেশকে একটা মানুষ ভিক্ষা দাও।

ইংরেজী কেতাবের অর্থ-বিজ্ঞানের সব ফরমুলাগুলি নিঃশেষে পড়িয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে ভাতে মরিতেছে, এ সমস্যার উত্তর তাহাতে ত মিলে না। সত্যই—এ—অ—দৃষ্ট।

বলিবে—অজন্মা হয়, অনাবৃষ্টি হয়,—এর প্রতীকার কে করিবে? বলিবে,—জমির উৎপাদানের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, জমিতে সার দেওয়া হয় না, কৃষক ভাল চাষ করিতে জানে না,—সে দোষ কাহার? বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক অমিতব্যয়ী, কাজেই ধার করে, শোধ দিতে পারে না, সুদের দায়ে জমির শস্য উড়িয়া যায়। বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক স্ত্রীর জন্য রূপার পৈছা তৈয়ার করে, মাটীতে টাকা পুতিয়া রাখে, কাজেই না খাইয়া

মরে। আরও যা যা বলিয়া আসিতেছ, এবং বলিতে চাও, তা সবি জানি। কিন্তু শুনিলে হয় ত বিশ্বাস করিবে না,—বোধ হয়, এ সকল কথার উপরেও কিছু বেশী জানি। বলি না কেন? বলিতে দেও না। আর এ ত শুধু কথা-কাটাকাটির ব্যাপার নয়। কথার মত কাজের ব্যবস্থা নাই, হইতে পার না, হইতে দেও না। যাহা কাজের কথা—তাহার পশ্চাতে যদি কাজ না থাকে, তবে সে হয় শুধু কথার কথা। তাহা বলিয়া লাভ কি? বাঙ্গলায় নব্য ন্যায় লইয়া যে বিতণ্ডা (Speculation) একদিন অনায়াসে চলিয়াছে, বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া আজ তাহা চলিতে পারে না। কেন না, অর্থ-বিজ্ঞান —তা সে বাঙ্গলারই হউক, আর আয়র্লণ্ডেরই হউক, শুধু বিতণ্ডা (Speculation) নহে।

আমরা যাহারা দেশের দুঃখ ও দুর্গতি লইয়া বক্তৃতা করি, তাঁহাদের মুখে সম্প্রতি বাঙ্গলার এই অর্থনৈতিক সমস্যার কত কল্পনা, জল্পনা ও বিতণ্ডা শুনিয়া শুনিয়া হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা যৌথ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই এই দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে,—শুনিয়াছি নাকি, জাতিভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে,—শুনিয়াছি, পাশ্চাত্য Industrialism এর ভ্রান্ত আদর্শে বিভ্রান্ত না হইয়া কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রচলন করিতে হইবে, সহর ছাড়িয়া পল্লীবাসী হইতে হইবে, নূতন ছাড়িয়া সনাতনে ফিরিতে হইবে ; ইত্যাদি।

কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কেন গেল, কিসে গেল, সে কথার উত্তরে ইতিবৃত্ত মুখ লুকায় কেন? এত যে অন্নকষ্ট, তবু রাশি রাশি অন্নের বিদেশে রপ্তানী কেন? যে টাকা জাতি একদিন ধার লইয়াছিল, এই মুখের গ্রাস তাহার সুদ যোগাইবার জন্য পাঠাইতে হইবে? উত্তম। কিন্তু কত দিন? যাবৎ না এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটা———, কে জানে, কে বলিবে, ভবিষ্যতে কি লেখা আছে?

আজ একটা জাতির মুখের গ্রাস, কি পাপে জানি না, বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি, জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, মরণোন্মুখ। এই অন্নকষ্টে কে বলিতে পারে, জাতির স্বভাবধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে নাই? কে বলিতে পারে, একটা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমে পশুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে কি না? দেশের এ হেন অবস্থায়, সাহিত্যের কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়? ধর্ম্ম যদি ধারণই করিতে না পারিল, তবে, সে ধর্ম্ম কি? সমাজ যদি এই জাতীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিল, তবে স্মৃতির আদেশ রঘুনন্দন দিলেও এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তত দিন এত দুঃখে তাহা মানিয়া চলিয়াও লাভ কি?

এ কি মৃত্যু? না হত্যা? না আত্মহত্যা?

বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্ম।— বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মের প্রকৃতি কি, বৈশিষ্ট্য কোথায়? ১৯শ শতাব্দীর সংস্কার-যুগে, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগে বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্ম কি নব বৈচিত্র্যে বিকসিত হইয়াছে, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, অথবা ইহা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

১৯শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটা সেবাধর্ম্ম ছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব জগতের প্রতি, জীবের প্রতি, সমাজের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাইতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-সাধনায় যেরূপ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ ছিল, তাহাতে প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সেবাধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালী একদিন বৌদ্ধ ছিল। ভগবান্ বুদ্ধের সেবাধর্ম্ম, পরবর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্মের দুইটি বিশেষ সাধনমার্গে—শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতটা রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেহই ভালরূপ ভাবিয়া দেখেন নাই। বাঙ্গালীর স্মৃতি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্মৃতি হইতে পৃথক্। স্মৃতির পার্থক্যে সমাজ-বিন্যাসেরও পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালীর সমাজবিন্যাস হইতে ও স্মৃতি হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সেবাধর্ম্মের প্রকৃত রূপটি বহু পরিমাণে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এই সেবাধর্ম্মের মধ্যেই জাতির নৈতিক উন্নতি বা অবনতির চিহ্ন আমরা পাই।

রাজা রামমোহন, এ যুগে জাতীয় সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম-চিন্তার দিক্‌টা যে রকম উন্নত, নীতির দিক্‌টা তেমনি অবনত। পরন্তু খৃষ্টান-ধর্ম্মের নীতিবাদ খুব উচ্চ এবং আমাদের অনুকরণযোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম্মমত এবং তাহার অনুরূপ সাধনা রামমোহনকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। অন্য পক্ষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব-সাধনা ও বৈষ্ণব-নীতিমার্গ রামমোহনের নিকট বিশেষরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল। কেহ বলিতে পারেন, এবং বলিয়া থাকেন যে, তখন তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিহাসে যাহা ঘটে, তাহাই একমাত্র প্রয়োজন, এবং তাহার অতিরিক্ত আর কিছু ঘটা অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইলে অবশ্য যাহা যাহা ১৯শ শতাব্দীতে ঘটিয়াছে, তাহাই সমর্থনযোগ্য এবং তাহার উপর আর কথা বলা চলে না। কিন্তু ইতিহাস এবং যুগধর্ম্ম যদি মনুষ্য-চিন্তার বিচারাধীন হয়, তাহা হইলে কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতীয় জীবনে যাহা ঘটে, তাহাকেই সমর্থন করা যায় না। রাজা রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত "লোকশ্রেয়ো"রূপ সামাজিক নীতিবাদকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ গ্রহণ করিলে কর্ম্মসন্ন্যাসকে অবস্থা, কাল ও অধিকারিভেদে একেবারে অস্বীকার করা অনেক সময়ে বড়ই কঠিন সমস্যা। তথাপি রামমোহন মধ্যযুগীয় কর্ম্মবিমুখতাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, এবং তাহার

নিরসনকল্পে শাস্ত্র ও যুক্তিকে সব্যসাচীর মত প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকের মতে এই লোকশ্রেয়ের প্রতিষ্ঠাই এ যুগে রাজা রামমোহনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর এ যুগের সেবাধর্ম্মে রামমোহনের "লোকশ্রেয়ে'র কি বিশেষত্ব, তাহা যুগবিশ্লেষণকারী চিন্তাশীল মনীষীদিগের সবিশেষ আলোচ্য, সম্ভবতঃ খৃষ্টান নীতিবাদের উপরেই লোকশ্রেয়ের ভিত্তি। আর এই খৃষ্টান নীতিবাদের অর্থ রামমোহন এইরূপ বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন যে, "তোমার উপর অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর।" বলা বাহুল্য, শাঙ্কর অদ্বৈতের ভিত্তির উপর রামমোহন তাঁহার লোকশ্রেয়োরূপ নীতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব-বেদান্ত বা লীলাতত্ত্বের উপরেও রামমোহনের নীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত নহে। রামমোহন-বন্ধু জেরেমি বেন্থামের নীতিবাদ অপেক্ষা "লোকশ্রেয়ে"র বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্বও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, রামমোহনের লোকশ্রয়ের দার্শনিক ভিত্তি শাঙ্কর-বেদান্ত-ঘেঁসা বাঙ্গালীর শাক্ত বেদান্তেও নহে, আর মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত এবং জীব, বলদেব-ব্যাখ্যা ত বৈষ্ণব-বেদান্তেও নহে।

সুতরাং রামমোহন যে সেবাধর্ম্ম বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল বাঙ্গালীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনমার্গের মধ্যে তত নাই—যত খৃষ্টান নীতিবাদের মধ্যে আছে। রামমোহনপন্থীরা বলিবেন, ইহারও প্রয়োজন ছিল, ইহাও যুগপ্রয়োজনের ফল। একটা বৈদেশিক সভ্যতা কর্ত্তৃক সম্যক্ বিপর্য্যস্ত যে যুগ, তাহাকে বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়িরূপে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ইতিহাসে যুগের পরে যুগ আসে। পূর্ব্বগামী যুগের সাধনা লইয়া, তাহার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া, পরবর্ত্তী যুগ রূপান্তর গ্রহণ করে। বাঙ্গলা দেশে ১৯শ শতাব্দীর শেষে হইয়াছেও তাহাই। রামমোহনের পরবর্ত্তী যুগের লক্ষণসমূহকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, তাহার দ্যোতনাকে ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া, আমরা রাজা রামমোহনের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু সময় আসিয়াছে—যখন আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগকে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব বা তাহার দার্শনিক ভিত্তি অথবা সেই দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে নীতিবাদ এবং সেবাধর্ম্ম, তাহার কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মের উপর সাধনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে মিল বেন্থামের 'অধিকাংশের সুখবাদ' নিরসন করিয়া, ক্যাণ্ট ফিক্টের কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নীতিবাদকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাণ্ট ফিক্টের নীতিবাদের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ অথবা ক্যাণ্ট ফিক্টের নীতিবাদ যে বস্তু, দেবেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহাকে মার্টিনোর নীতিবাদকে হুবহু

গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে নীতিবাদ বাঙ্গলা দেশে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Institutions) গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বাঙ্গালী হিন্দুর নীতিবাদের বা সেবাধর্ম্মের কোন অভিনব উন্নত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। সাক্ষাৎভাবে সমাজ-সংস্কার হইতে তিনি সমধিক সঙ্কুচিত ছিলেন বলিয়াই, সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি চিন্তাক্ষেত্রে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক, যুগপৎ পৌরুষ এবং দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেবাধর্ম্মের এক অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্যরকমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার কঠোরতা ও প্রচণ্ডতা যেমন ভীষণ, ইহার অফুরন্ত দয়ার স্রোতও তেমনি গঙ্গাজলের মত স্নিগ্ধ ও সুশীতল। বাঙ্গলা দেশে একদিন সেবাধর্ম্মের একটি পর্ব্বত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, সেই অটল হিমাচল হইতে হৃষীকেশের গঙ্গাবারি বাঙ্গলা দেশকে প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। রুদ্রের জটা হইতেই দয়া ও সেবার গঙ্গা ঝরিয়া পড়িয়াছিল। ইহার উৎপত্তি শাক্ত ও বৈষ্ণব-বেদান্তেও নহে, খৃষ্টান অথবা ক্যাণ্ট ফিক্টের দার্শনিক ভূমিতেও নহে। বিধবার দুঃখে এত বড় পৌরুষ ও মহত্ত্বের বাণী বাঙ্গলা দেশে আর গর্জ্জে নাই, ক্ষুধিত ও দুঃস্থের হাহাকারে এত বড় দয়ার প্রবাহ বাঙ্গলা দেশে আর দেখা যায় নাই। মানুষের জন্য মানুষের যে সমবেদনা, সম-অনুভূতি, ১৯শ শতাব্দীর এই চিরস্মরণীয় চরিত্রে, আমরা তাহাই দেখিতে পাই। স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই,—ভয়ও যে না পাই, তাহা নহে, কেননা, চীৎকারও ত করি? প্রচণ্ডতাকে সহ্য করিবার শক্তি, তাহা সে দয়ারই হউক আর অত্যাচারেরই হউক, বাঙ্গালীর নাই।

বিদ্যাসাগরের পর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সেবাধর্ম্মের অনুকরণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সেবাধর্ম্মের প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আদর্শ এবং উপায় বিদেশী হওয়ার জন্যই হউক, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত ইংরেজী অশিক্ষিত বাঙ্গালীর একটা মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের জন্যই হউক, অথবা আর যে কারণেই হউক, কেশবচন্দ্রের সেবাধর্ম্ম বাঙ্গলায় সম্যক্ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যখন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের অনুগামী ব্রাহ্ম ছিলেন, তখনই তাঁহার মধ্যে সেবাধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া সেবার ভার নিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের সমতুল্য কেহই নহেন; দেবেন্দ্রনাথও নহেন, কেশবচন্দ্রও নহেন। উত্তরকালে যখন একদিন গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গল হইতে এই কেশরী সহসা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইতিহাসে ব্রাহ্মযুগ যখন অস্তমিত, দক্ষিণেশ্বরে মাতৃভাবে কালী-সাধনায় সিদ্ধ পরমহংস রামকৃষ্ণের যখন অভ্যুদয়, সেই যুগ-পরিবর্ত্তনকালে বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনমার্গের

দুই সিদ্ধ মহাপুরুষ যখন বাঙ্গলায় ভাবী যুগের অভ্যুদয়কে সূচনা করিলেন, সেই সময় হইতে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মের গতি ধীর-ভাবে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। এ যুগ রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের, শাক্ত ও বৈষ্ণবের, এক কথায় বাঙ্গালীর সাধনা ও সিদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। এ যুগের ব্রাহ্মধর্ম্ম অপসৃত, পর্য্যুদস্ত। ব্রাহ্ম-নেতৃগণ সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া কালপুরুষের অঙ্গুলি-সঙ্কেত বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লিখিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছেন।

তাহাতে দুঃখ কি? আর তাহাতে লজ্জাই বা কি? তরঙ্গের পরে তরঙ্গ উঠে, নদী অগ্রসর হয়। যুগের পরে যুগ আসে, জাতি অগ্রসর হয়।

আমরা বলিয়াছি এবং আবার বলি, এ যুগ রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের যুগ। এ যুগের উপযোগী শাক্ত ও বৈষ্ণবের যুগ। বাঙ্গালী ১৮শ শতাব্দীতে, সাধনধর্ম্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব ছিল, বিংশ শতাব্দীতেও তাহাই আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ শুধু ১৮শ শতাব্দীর প্রতিধ্বনি বা ফটোগ্রাফ্ নহে; বিংশ শতা-ব্দীর জীবন্ত বিগ্রহ। ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর পরিবর্ত্তন ও উন্নতির চিহ্নসমূহ তাঁহারা ধারণ করিয়া তবে বাঙ্গালীর ভাবী যুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধারায়, বাঙ্গলার প্রাণের ধারায়, অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া ইতিহাসের নিয়ামক-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই, এই দুই সাধন ধারায় সেবাধর্ম্ম কি 'রূপ' গ্রহণ করিয়াছে? আমরা বলিয়াছি, প্রাগ্ ব্রিটিশ যুগের শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনায় এবং তদীয় সেবাধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন হস্ত কার্য্য করিয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আবার বাঙ্গালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনায়, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মানুভূতিতে সেবাধর্ম্মে খৃষ্টান অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার হস্ত প্রচ্ছন্নে কার্য্য করিতেছে কি না? তাহার কতটা অপরিহার্য্য, কতটাই বা বর্জ্জনীয়?

পরমহংস রামকৃষ্ণ ধর্ম্মের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত অশ্ব নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছিল, আটলাণ্টিকের 'উভতীর' দিগ্বিজয়ের জয়-নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ইহা অলৌকিক, আশ্চর্য্য অথচ বাঙ্গালী ইহা পারি-য়াছে। কিন্তু বিবেচ্য এই, স্বামী বিবেকানন্দের যে সেবাধর্ম্ম, তাহার ভিত্তি কোথায়?

শাঙ্কর অদ্বৈতে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন খৃষ্টান নীতিবাদের সাহায্যে সেবাধর্ম্ম প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতের ভূমিতেই, রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের এইখানে একটি খুব বড় প্রস্থান। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ এইখানে অধিকতর আত্মস্থ ও গৌরবান্বিত।

স্বামী বিবেকানন্দ যেন জ্ঞাতসারেই রামমোহনকে নিরসন করিয়াছেন। বিবেকানন্দ খৃষ্টান সেবাধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিকে আক্রমণ করিয়া বলিতেছেন, "খৃষ্টান বলেন,

প্রতিবেশীকে ভালবাস, কিন্তু কেন,' তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন না।" স্বামীজীর যুক্তি এই, প্রতিবেশীকে কেন ভালবাসিব? প্রতিবেশী আমার কে? সে দুঃখ পায়, তাতে আমার কি? ভগবানের আদেশ? আমি যদি না মানি? যে আদেশে আমি না বুঝিয়া যন্ত্রবৎ চালিত হইব, সে আদেশ আমাকে যন্ত্রই করিবে। কাজেই খৃষ্টান সেবাধর্মের কোন ভিত্তি নাই। অন্যপক্ষে অদ্বৈত বেদান্ত বলেন, কেহ তোমার প্রতিবেশী নয়, তুমিই সব। সুতরাং তুমি কি তোমার দুঃখ দূর করিবে না? জগতের যেখানে যে অত্যাচার-প্রপীড়িত, অনাহারে ও রোগে ক্লিষ্ট, সেখানে তুমিই তাহাদের মধ্যে দুঃখ পাইতেছ। জ্ঞান দ্বারা এই বোধ, এই উপলব্ধি আয়ত্ত করিয়া জগতের সেবা কর। বাঙ্গালীর নবযুগের সেবাধর্মের এই তত্ত্ব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সম্প্রদায় এই অদ্বৈত-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া এ যুগে সেবাধর্মে ব্রতী হইয়াছেন।

কিন্তু শাক্ত বা অদ্বৈত বেদান্তই বাঙ্গালীর একমাত্র সাধনধারা নয়, এ যুগের নয়। বিজয়কৃষ্ণ যে ধর্মের জন্য শেষ-জীবনে মুমুক্ষু হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর যে ধর্ম বিজয়কৃষ্ণে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের, তাহার সাধনায় এ যুগে সেবাধর্ম কি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং করিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ এ যুগে যে ধর্মের অবতার, নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির সেই বাঙ্গালীর প্রাণধর্মের -সেবার প্রতিষ্ঠান। বৈষ্ণব বেদান্তে বলে, 'তুমি আমার, আমি তোমার।' তুমি যদি আমার, হে দুঃস্থ নিঃসহায়, এস, আমার বক্ষে এস, আমার বাহুর বন্ধনে এস। তোমার ক্ষুধা আমাকে দাও, তোমার ব্যাধি আমাকে দাও, তোমার পাপ—হে লম্পট,—হে কুলটা, তাও আমাকে দাও। কেননা, তুমি যে আমার। আমি যে তোমার। যাহা আমার, তাহাকে আমি বর্জ্জন করিব কিরূপে? তুমি বাধা দিবে দাও, কিন্তু যাহা আমার, যে আমার, তাহাকে আমি ছাড়িব কিরূপে? তাহাকে আমি বিচার করিব না, শাস্তি দিব না, সে শক্তি আমার কোথায়, তাহাকে আমি শুধু বক্ষে জড়াইয়া ধরিব। এই ভাবের প্রেরণা হইতে নবদ্বীপের সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির। ইহা বাঙ্গালীর বৈষ্ণব বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে বাঙ্গালী বিধবার দুঃখে নবদ্বীপে মাতৃমন্দির যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পৌরুষ ও মহত্ত্ব, তাহার জন্য লাঞ্ছনা-ভোগ ও নির্য্যাতন সহ্য করা বাঙ্গলার একদল অখ্যাত সেবকমণ্ডলীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাসে স্মরণীয় করিতেছে।

শ্রীঃ—

নারায়ণ

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা]   [শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল।

বেণের মেয়ে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

(৭)

ভবদেব বলিতেছেন :—"যাহারা ফুলের ব্যবসা করে, তাহাদের আমরা সজ্জাতি বলিয়া লইতে পারি, তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারি, তাহাদের কাছে ফুল লইয়া ঠাকুর-দেবতাদের দিতে পারি, কিন্তু এই বৌদ্ধদেশে একটা বড়ই বিপদ্ দেখিতেছি। এখানকার মালীরা মালঞ্চে শুধু যে ফুলগাছ পোঁতে, তা নয়, মুরগীও পোষে, আর মুরগীর ডিমগুলাকে ফুলের সঙ্গে ফুল বলিয়া বিক্রয় করে। বৌদ্ধদেব পুষ্পপাত্রে যেমন সারচন্দনের বাটি, রক্তচন্দনের বাটি থাকে, তেমনই মুরগী-ফুলেরও একটি বাটি থাকে। এ ফুলও অন্য ফুলের সঙ্গে তাহারা ঠাকুরের উপর চড়ায় এবং অনেক সময়ে ডিম ভাঙ্গিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দেয়। এই সকল মালীদের আমরা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করিব। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের যে সকল গ্রাম দেওয়া আছে, সেখানে আমরা মালীদের মুরগী পুষিতে দিই না, মুরগীর ডিম ছুঁইতেই দিই নাই। আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করি, তাহাদের ফুল দেবতাদের অর্পণ করি। তাহারা বিবাহের টোপর ও ময়ূর তৈয়ার করে; ফুলের, শোলার ও তালপাতার গহনা তৈয়ার করে; ব্রাহ্মণীরা ও ব্রাহ্মণকন্যারা সেই গহনা পরিয়া থাকে।

সেকালে যে সকল নাপিত বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডে ক্ষৌরী করিত, বিবাহের সময় তাহারা নানা কাজ করিত। সে জাতি আর বাঙ্গলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঢ়দেশের

জঙ্গলে একদল ক্ষৌরী-করা লোক আছে, তাহাদের দ্বারাই বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা কাজ চালাইয়া লইয়া থাকে। ভিক্ষুরা চেষ্টা করে নিজে নিজে কামাইতে, কিন্তু সব সময়ে পারিয়া উঠে না। এই নাপিতেরা তাহাদেরও ক্ষৌরী করিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষম সমস্যা আছে। এই নাপিতেরা সকলেই কাকের মাংস খায়। সুতরাং উহাদের স্পর্শ করিতে নাই, উহাদের জল আচরণ করিতে নাই, উহাদের হাতে কোন কাজ লওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয়। সুতরাং নাপিত আনাইতে হইয়াছে। এই নাপিতের বংশ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। সাতগাঁয় উহাদের জন্য একটা জায়গা দিতে হইবে। ক্রমে আমাদের নাপিতেরা যাহাতে বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা কাক-খাদক নাপিতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

বাঙ্গলায় বড় বড় গোঠ আছে। গরু চরাইবার এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের জমী আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এখানকার গোয়ালারা খুব প্রবল, দলেও খুব পুরু; কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়। অনেকেই গরু দাগে, দামড়া করে, নানারূপে গরুকে যন্ত্রণা দেয়, ফুকা দিয়া দুধ বাহির করে, গাই দিয়া লাঙ্গল টানায়। এই সকল কদাচারী গোয়ালার দুধ খাওয়াও নিষেধ। কারণ, তাহাদের স্বভাব এত খারাপ যে, তাহারা দুধে জল না দিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের জল আচরণ করা ব্রাহ্মণের কোনমতেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গ্রামে সেই জন্য আমরা সদ্গোপ নামে আর একটি গোপজাতির সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এ সকল কদাচার নাই। তাহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শিখিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার শিখিতেছে। অন্য গোয়ালারা যাহাতে এই দলে মিশে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গলা ত নদীর দেশ, জলের দেশ। মাছ ধরাই এখানকার অর্দ্ধেক লোকের জীবন। নানাজাতির লোকে মাছ ধরে—যেমন কৈবর্ত্ত, তীওর, জেলে, মালা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই নামে বৌদ্ধ—বলে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', কিন্তু কাজে কিছুই নয়। বৌদ্ধদের প্রথম শিক্ষা—'প্রাণিহিংসা করিও না।' তা ত ইহারা দিনরাত করে। সেই জন্য বৌদ্ধস্মৃতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি ইহারা জাতি-ব্যবসা ত্যাগ করে, লাঙ্গল চালায় বা অন্য ব্যবসা করে, তবে বৌদ্ধেরা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে রাজী আছে। এইরূপে শিক্ষা পাইয়া অনেক জেলে হেলে হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে আমাদের দলে লইয়া আসা কিছু কঠিন। কারণ, ইহাদের সঙ্গে কোনরূপ আচার-ব্যবহারই আমাদের চলিবে না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাত হইতে উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। নইলে বৌদ্ধেরা এই হেলেদের লইয়াই প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বসিবে।"

মহারাজাধিরাজ তাঁহার সকল কথাতেই সায় দিলেন। ভবদেব বিহারীকে বলিয়া দিলেন, "তুমিও এইমত চলিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

(১)

ভবদেব ভট্ট বারংবার মস্করীর কথা তুলিতেছিলেন। মস্করীকে কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে? মস্করী প্রায়ই উপস্থিত থাকিত। সে বলিত, "আমার কথা সকলের শেষে। আপনাদের সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কথা, আমার কথার পর আর কথা থাকিবে না।" মহারাজাধিরাজ ও ভবদেব তাহাতেই রাজি হইলেন। এইখানে মস্করীর একটুকু পরিচয় দিয়া রাখি।

রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পাঁচ গোত্র। আদিশূর রাজা ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনোজের রাজা যশোবর্ম্মার কাছে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কারণ, তাঁহার রাজবাড়ীর চূড়ায় বাজপাখী বসিয়াছিল। সেটা তখন বড় অলক্ষণ, উৎপাত বা অদ্ভুত বলিয়া লোকে মনে করিত। সুতরাং ঐ অলক্ষণের শান্তি না হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া আদিশূর রাজা যশোবর্ম্মার কাছে শান্তিযজ্ঞের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। অনেকে মনে করিতে পারেন, যজ্ঞে ত তিন জন ঋত্বিক্ হইলেই হয়। না হয়, একজন ব্রহ্মা বেশী থাকিলেন। পাঁচ জন কেন হইবে? এ সম্বন্ধে একটা ভারি কথা আছে। দক্ষিণদেশে এখনও তিন জনে যজ্ঞ হয়; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে যাজ্ঞবল্ক্য পাঁচ জন ঋত্বিক্ ভিন্ন কার্য্য হইবে না, ব্যবস্থা করিয়া যান। যজুর্ব্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ করিয়া দুই বেদ ধরিলে ও অথর্ব্বকে বেদের মধ্যে ধরিলে পাঁচখানা বেদ হয়। পাঁচখানা বেদে পাঁচ জন ঋত্বিক্ লইয়া যজ্ঞ হইত। তাই আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চান; যশোবর্ম্মাও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠান। রাজারা এই পাঁচ জনের সন্তানসন্ততিকে অনেক গ্রাম প্রদান করেন। বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের একজন কাঞ্জিবিল্বী নামে এক গ্রাম পান। সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বংশবিস্তারও হয়, বিদ্যাবুদ্ধির যশও খুব হয়। আবার রাজারা সেই গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিকটে নিকটে আরও চারি পাঁচখানি গ্রাম দেন। গ্রামগুলির নাম তাপবাড়ী, চতুর্থ খণ্ড (চোটখণ্ড), পিশাচখণ্ড, রূপডলা ও হিজলবন। এই সকল গ্রামেই কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস হইয়াছিল। যিনি পিশাচখণ্ড পাইয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র হয়। এক পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন, আর একজনের পুত্র আমাদের মস্করী। মস্করী গ্রামের গ্রামীণ বা গাঁঞী। সুতরাং তাঁহার অর্থের অসদ্ভাব নাই। গ্রামে কতকগুলি কুমার, গোপ ও শুঁড়ীর বাড়ী। তাহাদের কুলকর্ত্তা মস্করী। মস্করীর পৈতৃক সম্পত্তি বেশ ছিল। আর একখানি গ্রাম তাঁহার নিজের। রাজাকে কর দিতে হয় না, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাজার। সমস্ত গ্রামের উপস্বত্বই মস্করীর। মস্করী পণ্ডিতও খুব ভাল, শাস্ত্র ও কাব্য দু'য়েতেই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। তাহার উপর নাচ-গান, এমন কি, চৌষট্টিকলায়

তাঁহার মত নিপুণ লোক তখন কমই দেখা যাইত। তবে তিনি কিছু শ্রাদ্ধানন্দী। গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহাদের বড় আনন্দ। তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রাদ্ধের খোলায় উপস্থিত থাকেন; পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করা, খাটাখাটানতে তাঁহাদের বিশেষ আনন্দ। সেই জন্য লোকে তাঁহাদের শ্রাদ্ধানন্দী বলে। শব্দটার অর্থ ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। পরের কাজে, বিশেষ আমোদ-প্রমোদের কাজে যাঁহার আনন্দ, লোকে তাঁহাকেই শ্রাদ্ধানন্দী বলে। অতিপ্রাচীনকালে বড় বড় সহরে নাগর বলিয়া এক দল লোক থাকিত। তাহারা পৈতৃকসম্পত্তি ভোগ করিত, উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিত, নানা কলায় চতুর হইত, নাচগানের আসরে কর্ত্তৃত্ব করিত; বৈঠকখানা সাজাইত। তবে নাগরেরা একটু স্ত্রীলোকঘেঁষা ছিল। তাই বলিলাম, এখন নাগর বলিতে একটু লচ্‌পচে স্বভাবের লোক বুঝায়। মস্করীর কিন্তু সে দোষ একবারেই ছিল না। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও স্বদার-সন্তোষী। তাঁহার মেয়ে নাই, ছেলে নাই, ঢেঁকি নাই, কুলা নাই। তিনি পরের কাজ করিয়াই বেড়ান। যেখানে পাঁচজন, সেইখানেই আমাদের মস্করী।

সব কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজাধিরাজ মস্করীকে স্মরণ করিলেন। অমনি মস্করী উপস্থিত।

"মস্করী, তুমি কি চাও?'

"মহারাজাধিরাজ, আমি এই চাই, আপনি রাজসভা করেন।"

"এখন ত আমরা রাজসভাই করিতেছি।"

"এ মন্ত্রিসভা—মন্ত্রণার সভা—রাজকার্য্যের সভা—"

"তুমি আবার কিরূপ সভা চাও?"

"আমি চাই, মহারাজাধিরাজ সভাপতি হইয়া বসিবেন; দেশবিদেশ হইতে শাস্ত্রে ও কাব্যে পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি তাঁহাদের কাব্য এবং গ্রন্থ পরীক্ষা করিবেন ও তাঁহাদের পুরস্কার দিবেন। পণ্ডিতদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবতেরাও আসিবেন এবং নানাকলায় আপনাদের নিপুণতা দেখাইবেন, মহারাজাধিরাজ তাঁহাদের কারিগরী পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দিবেন।"

"সে ত আর এক দিনে হয় না।"

"না মহারাজাধিরাজ, এক দিনে হয় না; অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে। আগামী বৎসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁয়ে—এই নৌকার উপরে রাজসভা হইবে। সমস্ত গুণিজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মহারাজাধিরাজ সকলের কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার দিবেন। "গুণিজন—খানা" নামে এক নূতন খানা হইবে। তাহাতে নিঃস্ব গুণিজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরীক্ষায়, মহারাজ, হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আচারী, অনাচারী কোন প্রভেদই থাকিবে না। কেবল গুণের বিচার হইবে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে বড় বড় রাজারা এইরূপ রাজসভা করিতেন। এইরূপ সভা হইতেই কালিদাস পুরস্কার পাইয়া বড় হইয়াছিলেন, পাণিনি—পিঙ্গলও বড় হইয়াছিলেন। মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগেরও আপনার সভায় পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

মহারাজাধিরাজ বলিলেন, “তথাস্তু।” ভবদেব বলিলেন, “পিশাচখণ্ডী, তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণের মত দান চাহিয়াছ।”

(২)

বৌদ্ধদের অধঃপাতে গুরুপুত্রের বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। রূপারাজার মৃত্যুতে তিনি যেন আর একবার পিতৃহীন হইয়াছেন। মেঘা যখন সব সৈন্য লইয়া মহাবিহারে আশ্রয় লয়, তখন গুরুপুত্র প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। বড় বড় গোলা-ভরা ধান ছিল, সব মেঘাকে দিয়া দিয়াছিলেন; নিজে যুদ্ধেও নামিয়াছিলেন। দুই মাস তাঁহার আহার-নিদ্রা ছিল না। কিন্তু যখন দেখিলেন, আর রক্ষা হয় না, তখন মেঘাকে বলিলেন, “তুমি পশ্চিমদ্বার দিয়া পলাও, আমি পূর্ব্বদ্বারে গিয়া হরিবর্ম্মার হাতে দুর্গ সমর্পণ করি।” দুর্গের চাবি পাইয়া হরিবর্ম্মা কি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুরুপুত্র এখন মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার বিশাল সাম্রাজ্যে মহাবিহারের অধিকারী। রাজা বিধর্ম্মী। তিনি বিহার রক্ষা করেন বটে, কিন্তু বিহারের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। একটি মুখের কথায় বিহারের ৩০ খানি গ্রাম অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সে ৩০ খানি গ্রামের জন্য মহারাজাধিরাজকে খাজনা কিছু দেন বটে, সে নাম মাত্র। বিহারে আর তেমন গোলাভরা ধান থাকে না। ডাল-তরকারী, দুধ-মাখনের যে প্রচুর যোগাড় হইত, তাহাও আর হয় না। শিষ্যদের মধ্যে সকলেই শ্রীহীন হইয়াছে। বেণেরা একেবারেই তাঁহাদের হাতছাড়া। অন্যান্য জাতির ধনী মানী লোক সব ব্রাহ্মণদিগের দিকেই গড়াইয়া পড়িতেছে, বৌদ্ধদিগের দিকে আর বড় কেহ আসিতে চায় না। সুতরাং মহাবিহারের আয়ের পথ চারিদিক্ হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যয়ের ভাগ বরং বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুমাত্র কমে নাই। কেননা, বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বড় বড় দাতা ছিলেন, মহাবিহারও তার মধ্যে একজন, এখন মহাবিহারই একমাত্র দাতা, তাঁহাকে সকল দিক্ই দেখিতে হয়। যে দিন মহাবিহারের সম্মুখে মহাসভা হয়, তখন সেই প্রকাণ্ড পালের নীচে ব্রাহ্মণদের বামদিকে ব্রাহ্মণদের গালিচা হইতে তিন হাত তফাতে খাসের ও পিঠে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বসিবার স্থান হয়। বলিতে হইবে না, সেখানে গুরুপুত্রের আসন সকলের আগে। তিনিও নিপুণ হইয়া সে দিনকার ব্যাপার সব দেখিতেছিলেন। যখন ভবদেব বলিলেন—“মহারাজাধিরাজ, রূপনারায়ণের রাজ্য লোপ হইয়া গেল”, তখন গুরুপুত্রের মুখে যেন কালী মাড়িয়া দিল। যখন মহাবিহারের গ্রামগুলি হিন্দুরা দখল করিয়া লইল, তখন রাগে, ক্ষোভে গুরুপুত্র অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহার পর মায়া যখন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল, গুরুপুত্র তাহাকে দেখিলেন। তাহার মুখে পূর্ব্বে যে বিষাদের ছায়া দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাহার মুখ এখন আরও উজ্জ্বল, হাস্যময়, আনন্দময়। গুরুপুত্র এত দিন তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি মায়ার জন্য আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের আরশীতে মায়ার যে ছবি ছিল, তিনি সে ছবিতে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া আবার তাঁহার জপমালা হইল। কিন্তু হায়, সেকাল আর একাল! তখন তিনি রাজার গুরুপুত্র, এমন কি, গুরু বলিলেও হয়। আর বিহারী একজন সামান্য প্রজা। বিহারীর মেয়ে তা'র চেয়েও সামান্য। এখন বিহারী রাজা, বিহারীর মেয়ে রাজকন্যা। আর তিনি—এক বিধর্ম্মী, ঘৃণিত, পদদলিত সম্প্রদায়ের গুরু। এখন তাঁহার পক্ষে মায়ার কামনা বামন হইয়া চাঁদে হাত। কিন্তু যৌবনের উদ্দাম বাসনার গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি জানেন, তিনি ভিক্ষু এবং এ সকল কামনা ভিক্ষুর উচিত নয়। "কিন্তু ভিক্ষু হইলেও এখন ত সকলেই শক্তি লয়। শক্তি ভিন্ন ত সাধনাই হয় না। সুতরাং আমারও শক্তি চাই, উপযুক্ত শক্তি চাই। বলপূর্ব্বক শক্তি লওয়া চাই। ইচ্ছা পূর্ব্বক যে আসিবে, তাহাতে আমার শক্তির বিকাশ কই? পরকীয়া শক্তি ভিন্ন শক্তিই হয় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া না আনিলে, সে শক্তির দ্বারা সাধনা হইবে কিরূপে?"

(৩)

মায়াদের গোলা গঙ্গার এক বাঁকের মাথায়। যে দরজা দিয়া গোলায় ঢুকিতে হয়, সেটা খুব উচা। লোকে হাতীর পিঠে গোলার ভিতর ঢুকিবে, এইমত করিয়া দরজা হইয়াছে। দরজার মাথার উপর দুইতালা ঘর আছে। প্রথম তালার সামনে গঙ্গার দিকে একটি ঝরকা আছে। ঝরকাটি দেওয়ালের বাহিরে। সেখানে বসিলে তিন দিক্ দেখা যায়। মায়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এইখানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। আবার সন্ধ্যার সময়েও এইখানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী, সমুদ্রের একটা হাতের মত ডাঙ্গায় আসিয়া ঢুকিয়াছে। মায়া গোলায় ফিরিয়া আসিয়া অবধি দু'বেলায়ই দেখিতেছে, এই প্রকাণ্ড সমুদ্রের খাড়ী নৌকায় ছাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মনে হইত, ডাঙ্গায় যেমন একটি প্রকাণ্ড নগর আছে, জলের মধ্যেও তেমনই এক প্রকাণ্ড নগর বসিয়াছে। সম্মুখে, বামে, ডাইনে যে দিকে দেখ, নৌকার সারি। নৌকায়ও অসংখ্য লোক, দিনরাত্রি কাজকর্ম্ম হইতেছে। রাজাদের নৌকা দু'খানি প্রায়ই মায়ার গোলার সামনে থাকিত।

এক দিন সকালে মায়া দেখিল, মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার নৌকা হইতে মহারাজা

রণশূর আপন নৌকায় যাইতেছেন। দুই নৌকার মাঝখানে একটি সিঁড়ি পড়িয়াছে। মহারাজাধিরাজ কোলাকুলি করিয়া রণশূরকে তাঁহার নিজের নৌকায় পৌছাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মাথায় কি একটা উজ্জ্বল জিনিস পরাইয়া দিলেন। রণশূর পঞ্চাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজাধিরাজ তাঁহার হাত ধরিয়া কয়েকটি কথা কহিয়া আপন নৌকায় ফিরিলেন। সিঁড়ি খুলিয়া লওয়া হইল। রণশূরের নৌকা ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নৌকা খুলিয়া দিল। প্রকাণ্ড জলনগরের যেন চারি ভাগের একভাগ সরিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রণশূরের বাহিনী দক্ষিণদিকে গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। আর কিছুই দেখা যায় না। মায়ার চক্ষু ফিরিল। সে শুনিল, নানারূপ বাদ্য একযোগে বাজিতেছে।

ক্রমে হরিবর্ম্মার নৌকাগুলিও ছাড়িয়া দিল। কতক উত্তরমুখে গিয়া যমুনায় প্রবেশ করিল, কতক দক্ষিণমুখে সমুদ্রে যাইতে লাগিল। হরিবর্ম্মার নিজের নৌকা ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময়ে বিহারী দত্তের নৌকা গিয়া সেখানে লাগিল। বিহারী মহারাজাধিরাজের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সেই মস্করী। দুই নৌকাই চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া বিহারী ও মস্করী আপন নৌকায় উঠিল ও দুই নৌকায় ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বিহারী গোলার দিকে আসিতে লাগিল, আর মহারাজাধিরাজ দক্ষিণ-সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

মায়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই ত কিছু পূর্ব্বে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর দেখিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। এখন দেখি, যে দিকেই দেখি, কেবল জল! কেবল জল! ওপারের গাছপালা রেখামাত্র দেখা যাইতেছে। উপরে কেবল আকাশ, নীচে কেবল জল।"

মায়া এই চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে পিছনদিকে শিশু-কণ্ঠে কে ডাকিল—'মা!' মায়ার ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল, সে পিছন ফিরিয়া দেখে, তাহার সেই হবু ছেলে দু'হাত তুলিয়া তা'র কোলে উঠিবার জন্য ডাকিতেছে—'মা!' মায়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। দুই হাতে তাহাকে নাচাইতে লাগিল, আর বার বার চুমা খাইতে লাগিল। সে যত হাসে, মায়া তত চুমা খায়। তাহার হাসিরও বিরাম নাই, মায়ার চুমারও বিরাম নাই। এমন সময়ে নীচে হইতে জলদগম্ভীরস্বরে কে বলিয়া উঠিল—"মা কোথায় গো?" সে শব্দ কয়েক মাস ধরিয়া শুনিয়া শুনিয়া মায়ার সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। মায়া ছেলেটিকে এক দাসীর কোলে দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

একটা নীচের তালায় একজনের সহিত দেখা হইল। মায়া তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি আমাদের মস্করী। তিনি বলিলেন, "মা, আজ বেলা বড় অধিক হইয়া গিয়াছে; বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তোমায় কেবল একটি কথা বলিয়া যাই। আস্‌ছে বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় মহারাজাধিরাজ সাতগাঁয়ে বসিয়া শাস্ত্রে, কাব্যে ও

শিল্পকলায় পরীক্ষা লইবেন। তোমাকে কাব্যে পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি শীঘ্র সাতগাঁ ছাড়িয়া যাইব। সকল পণ্ডিত-সমাজেই আমাকে ঘুরিতে হইবে। আমি তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব।"

"সে কি বাবা! আমি কিসে পরীক্ষা দিব? আমি ত বাঙ্গলা বই আর কোন ভাষাই জানি না। শিল্পকলাতেও আমার তেমন অধিকার নাই।"

"তুই মা বাঙ্গলায় দু'টা গান লিখে রাখিস্। আর যা হয় কিছু শিল্পকার্য্য করিয়া রাখিস্। এত বড় মহাসভা হ'বে, তুই সেখানে থাকিবি না, আমার তা ভাল লাগিবে না।"

"আপনার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইলাম। তবে কি আমার পোষ্যপুত্র লওয়ার সময় আপনি থাকিবেন না? এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া—এ ত আপনারই প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে।"

"আসিব রে আসিব। যেখানেই থাকি, সে দিন ঠিক হাজির হইব। তোর কোল-যোড়া ছেলে হ'বে, আমি দেখিব না ত দেখিবে কে?"—বলিয়াই মস্করী মায়ার গোলা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিহারী বাহিরে মেয়ের গোলার কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন। মায়া আসিয়া সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে মায়া, এখনও তোমার খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। যাও, তুমি এখন খাও গে।"

"বাবা, আজ ত বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। আপনি কেন আমার এইখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া যান না।"

"না রে, না পাগ্‌লী, দৌহিত্রের মুখ না দেখিলে কি মেয়ের বাড়ীতে খাইতে আছে? তুই যে দিন পোষ্যপুত্র নিবি, সেই দিন তোর বাড়ীতে খাইয়া যাইব।"

বিহারী চলিয়া গেল। মায়াও বাড়ীর ভিতর আসিলেন--আসিয়া দেখিলেন, সেই অল্পবয়সী ভিক্ষুণী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

(৪)

বেলা এক প্রহর হইয়াছে। গুরুপুত্র স্নানাহ্নিক সারিয়া পাঠে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একখানি তালপাতার পুঁথি, দেখিতে মাঝারি গোছের। তাহাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছে। সবগুলিই সহজধর্ম্মের মূলগ্রন্থ। সব সংস্কৃতে লেখা, প্রায়ই অনুষ্টুপ্ ছন্দে। গুরুপুত্র বাছিয়া বাছিয়া নিপুণ হইয়া একখানি গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন—তাহার নাম অদ্বয়সিদ্ধি। পুঁথিখানি এক রাজকন্যার লেখা। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি সহজধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বপ্রথম বজ্রবারাহীর পূজা প্রচার করেন। এ আমলের বৌদ্ধদের

মধ্যে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছিল। আমাদের গুরুপুত্র তাঁহারই কন্তার বই পড়িতেছেন—তিনি পড়িতেছেন :—

"ন কষ্টকল্পনাং কুর্য্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
স্নানং শৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্ম্মবিবর্জ্জনম্॥
ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান্।
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্য্যাৎ নিত্যং সমাহিতঃ॥"

"কিছুতেই কষ্ট করিবে না, উপবাস করিবে না, ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার দরকার নাই, স্নান করিবে না, শৌচ করিবে না, 'গ্রাম্যধর্ম্ম' ত্যাগ করিবে না, কাঠ-পাথর-মাটীর দেবতা নমস্কার করিবে না। সর্ব্বদা নিপুণ হইয়া দেহেরই পূজা করিবে।"

তিনি আবার পড়িতেছেন :—

"সর্ব্বান্ সমরসীকৃত্য ভাবান্ নৈরাত্ম্যনিঃসৃতান্।
ভাবয়েৎ সততং মন্ত্রী দেহং প্রকৃতিনির্ম্মলম্॥"

"সকল ভাব পদার্থের মূলেই অভাব, অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ভাবপদার্থই এক। তাহাদের 'রস' একই প্রকার। সুতরাং সাধকের উচিত, স্বভাবতঃ নির্ম্মল যে দেহ, তাহারই ধ্যান করা।"

গুরুপুত্র চিন্তা করিতেছেন :—তাই যদি হ'ল, দেহ যদি স্বভাবতঃই নির্ম্মল, তবে আমরা যে ময়লার কথা ভাবি, পাপের কথা ভাবি, সেটা ত দেহের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেটা উঠ্‌কা জিনিস, আসিয়া জুটে। তা'কেই বলে 'বিকল্প।' সে ত আসল জিনিস নয়। আসল জিনিসে ময়লা ধরিতে পারে না। সেই যে নির্ম্মল দেহ, তাহারই ধ্যান কর, তাহারই পূজা কর। সে পূজায় উপবাসাদি কিছুই করিবে না। যাহাতে কোনরূপ কষ্ট হয়, এমন কোন কার্য্যই করিবে না। কাঠ-মাটী-পাথরের দেবতা, এ সবও উঠ্‌কা জিনিস। আসল জিনিস দেহ। তাহারই পূজা কর, তাহারই ধ্যান কর। এ পূজা, এ ধ্যান কি প্রকার? যাহাতেই কায়ের ও মনের তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে বন্ধ-মুক্তির কথাই কি?

"যেন যেন হি বধ্যন্তে জন্তবো রৌদ্রকর্ম্মণা।
সোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ॥"

"যে সকল ভয়ঙ্কর কার্য্যের দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, কৌশলের সহিত সেই সকল কার্য্য করিলে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" সে কৌশল কি?—গুরুর উপদেশ। গুরুর উপদেশ হইলে—

"রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥"

"যে আসক্তিতে লোকে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়।—এই যে বিপরীত ভাবনা, এই যে রাগের বিপরীত শক্তি, ইহা বুদ্ধতীর্থিকেরাও জানিতেন না।"

শ্রীসমাজে বলেন :—

"পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্ন চ পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্‌বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥"

"কামনার যে পাঁচটি বিষয় আছে, তাহার একটিকেও ছাড়িও না, তপস্যা করিয়া দেহকে পীড়ন করিবে না, সুখ ভোগ করিতে করিতেই যোগ ও তন্ত্রমতে 'বোধ' লাভ করা যায়।"

তবেই ত সুখ ছাড়া হ'বে না। সে সুখ আবার কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ নয়। এই দেহেরই সুখ। 'পঞ্চকামোপভোগে'র সুখ। পঞ্চকামোপভোগের মধ্যে আবার স্ত্রীই সকলের প্রধান। কেননা, লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সম্বৃত্যা রূপমাশ্রিতা।"

"তিনিই আসল প্রজ্ঞা। অথবা আসল প্রজ্ঞাই তিনি। তাঁহার এই যে রূপ দেখিতেছ, সেটা উঠ্‌কা জিনিস—বিকল্প—মিথ্যা। ঐ রূপে ডুব দাও, আসল জিনিস দেখিতে পাইবে।" তাই আবার লক্ষ্মীঙ্করা বলিতেছেন :—

"সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্সা নৈব যোষিতঃ।"

অর্থাৎ "কোন বর্ণের নারীকেই ঘৃণা করিও না।"

ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা আরও বলিতেছেন :—

"ন চাধ্যাসক্তিং কুর্ব্বীত একস্মিন্নপি যোগবিৎ।
সমতাচিত্তযোগেন ভাবনীয়ো ভবার্ণবঃ॥"

"কিছুতেই আসক্ত থাকিও না। ভবার্ণবে যত কিছু পদার্থ আছে, সব একাকার দেখিও, সমান ভাবিও, সকল পদার্থেই এক রসের আস্বাদ পাইবে।"

"ভগবতী আমাদের ধর্ম্মটাকে কি সুখেরই করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বলিলেন, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই আসল আনন্দ। যোষিৎসম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।"

গুরুপুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এবং মনে মনে মায়ার রূপকল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বালক ভিক্ষু আসিয়া খবর দিল—মস্করী আসিতেছে। মস্করীর নাম শুনিয়াই গুরুপুত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—মস্করী ?—আমার কাছে ?—কেন ? প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।" কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা বড়ই উৎ-কণ্ঠা হইল—বড়ই ভয় হইল।

মস্করী সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইবামাত্র, গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই জনে আসনে বসিলে মস্করী প্রথমেই আরম্ভ করিয়া দিলেন :—

"আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়, আস্‌ছে বছরে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন রাজসভা হইবে। আমার অনুরোধ, আপনাকেও তাহাতে পরীক্ষা দিতে হইবে। আপনি অল্প-বয়সেই যেরূপ নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছেন, আপনার গুরুর মুখে আপনার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনি সাতগাঁতে থাকিয়াও যদি আমাদের সভাতে উপস্থিত না হ'ন, আমাদের সভা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

"আমি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিব ?"

"কেন ? আপনি অনেক ভাষা জানেন। আপনার যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি আছে। আপনার গুরু বলেন, সহজধর্ম্মে আপনি অতিপ্রবীণ। আপনাদের নিজের ধর্ম্মের উপরই যাহা হয় কিছু লিখিবেন। আমি সকলকেই সভায় যাইবার জন্য, পরীক্ষা দিবার জন্য, অনুরোধ করিতেছি। আপনি আমার একটু উপকার করুন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে সকল বড় বড় বাচক, বড় বড় পাঠক, বড় বড় পণ্ডিত আছেন, সেই সকল বিহারের ও সেই সকল পণ্ডিতের নাম দিলে, আমি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতে পারি।"

গুরুপুত্র, মস্করীর কোন কথাতেই 'না' বলিতে পারিলেন না ; নিরীহ ভালমানুষটির মত মস্করীর সব কথাতেই সায় দিলেন। মস্করী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি যে শুধু পুরুষদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহা নয়, অনেক স্ত্রীলোককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছি। রাজকুমারী মায়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলায় কবিতা লিখিয়া রাজসভায় উপস্থিত থাকিবেন। আচ্ছা, আপনাদের জ্ঞান-ডাকিনী-নিশু এখন কোথায় ? আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাই। আপনাদের মধ্যে আর কে কে প্রতিভাশালিনী রমণী আছেন, জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করি।"

গুরুপুত্র বলিলেন :—"আপনি যখন এ অধমের সাহায্য লইতে এত দূর আসিয়াছেন, আমি আমাদের দল হইতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের লইয়া যাইব ও যাহাতে তাঁহারাও পরীক্ষা দেন, তাহা করিব।"

"আপনার জয় হউক"—বলিয়া মস্করী প্রস্থান করিলেন।

গুরুপুত্র পুঁথিখানি বাঁধিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ঠাকুর হরিদাস

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ক্রোধোন্মত্ত পাইকেরা হরিদাস ঠাকুরকে একে একে বাইশ বাজারে লইয়া প্রহার করিল, তথাপি তিনি মরিলেন না দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। এক্ষণে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"এ কি মানুষের প্রাণ রে ভাই? এত মারণেও কি মানুষ বাঁচে? যদি মানুষ হইত, তবে দুই তিন বাজারের প্রহারেই মরিয়া যাইত। কি তাজ্জব! বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া ইহাকে মারিলাম—যার যত শক্তি মারিলাম, তথাপি দেখ, এখনও লোকটা বাঁচিয়া আছে! এখনও সেই হরিনাম ছাড়ে নাই! বুঝি বা এই ব্যক্তি পীর হইবে।"

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে,
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে?
মরেও না, আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

সত্য সত্যই যখন পাইকদের বিশ্বাস জন্মিল যে, ইনি অতিমানব, ইঁহার মৃত্যু নাই। ইহাতে উহারা যেমন বিস্মিত, তেমনি ভীতও হইল। ভয়ের বিশেষ কারণ এই যে, হরিদাস ঠাকুরকে প্রাণে বধ করিতে না পারিলে কাজী সাহেব সকলেরই গর্দ্দান লইবেন। তাই প্রাণের ভয়ে—

"যবন সকল বলে—ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ।
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার,
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সবাকার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর ঘাতকদিগের মুখের পানে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"আমি না মরিলে যদি তোমাদের মন্দ হয়, তবে এই দেখ, আমি মরিতেছি।" ইহা বলিয়াই ঠাকুর শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে আবিষ্ট হইয়া মহাসমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার

দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া রহিল! পাইকেরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে ধরাধরি করিয়া মুলুক-পতির দ্বারে নিয়া ফেলিল।

"হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়,
আমি জীলে তোমা সবার যদি মন্দ হয়,
তবে আমি মরি, এই দেখ বিত্তমান,
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান।
দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইলা,
মুলুকপতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

সকল আপদ্ চুকিল। আর মড়ার উপর খাঁড়া দিয়া কি হইবে? ইহা ভাবিয়াই মুলুকপতি বলিলেন—"এখন আর কি, ইহাকে নিয়া গোর দাও।" কিন্তু গোড়াই কাজী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, ইহাকে গোর দিলে ত ইহার সদ্গতি হইবে। এ ব্যক্তি বড় ঘরে জন্মিয়া যেমন নীচ কর্ম্ম করিয়াছে, পরকালেও ইহার তেমনই দুর্গতি হওয়া উচিত। অতএব ইহাকে ধরিয়া গঙ্গার জলে নিয়া ফেলিয়া দিলেই ইহার উপযুক্ত সাজা হইবে।

"মাটী লইয়া দেহ বলে মুলুকের পতি,
কাজী কহে তবে ত পাইবে ভাল গতি।
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম,
অতএব ইহারে যুয়ায় সেই ধর্ম্ম।
মাটী দিলে পরকালে হইবেক ভাল,
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কাজীর পরামর্শই অতি সুপরামর্শ বলিয়া বিবেচিত হইল। পাইকেরা হরিদাস ঠাকুরকে তুলিয়া নিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। ঠাকুর সর্ব্বশিবাস্পদ শবের ন্যায় সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। যবনেরা বুঝিল না যে, ঠাকুর জীবিত। কারণ—

"কৃষ্ণানন্দসুখসিন্ধুমধ্যে হরিদাস,
মগ্ন হৈয়াছেন, বাহ্য নাহিক প্রকাশ।
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়,
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস সুখদায়িনী ভাগীরথীর সুখ-শীতল সলিলে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন, আর তীরে তীরে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী ঠাকুরের ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গে যেন তরঙ্গের ছলে আপন কোমল কর বুলাইয়া বুলাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া দিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন।

"চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়,
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবনলাভ! ইহাতে সেই গঙ্গাতীর যে তখন কি প্রকার বিস্ময়-বিজড়িত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সদানন্দময় পুরুষ হরিদাস ঠাকুর এত নির্য্যাতনের পরেও প্রফুল্লবদনে হরিনাম করিতেছেন এবং শত্রুর বদনপানেও প্রসন্ন-নয়নে চাহিতেছেন, এ দৃশ্য, এ দৃষ্টান্ত স্বর্গেও দুর্ল্লভ। সমবেত জনসঙ্ঘ মস্তক অবনত করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং গম্ভীর উচ্ছ্বাসে মনের আনন্দে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া গঙ্গার এ কূল ও কূল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। যবনগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চিত্তে স্তম্ভিত হইল এবং পীরজ্ঞানে ঠাকুরের চরণে নিপতিত হইল; ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

"দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন,
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন।
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার,
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকের পতি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া অবিলম্বে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন। তখন—

"সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি দুই কর,
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর,
—সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর,
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু হেথারে,
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।

সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাই,
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস যবনরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন।

"যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ,
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

পুনরায় ফুলিয়ায়

ফুলিয়া হইতে হরিদাস ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্তই ফুলিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অদ্য বহু লোকে আসিয়া সংবাদ দিল যে, হরিদাস ঠাকুর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন—এই আসিলেন বলিয়া। সে কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে মুখে সমস্ত ফুলিয়ায় রটিয়া গেল। ফুলিয়ার স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক সকলেই ঠাকুরকে দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার আগমন-পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। ফুলিয়া-সমাজের মধ্যে এত দিন যাঁহারা হরিদাস ঠাকুরকে তেমন ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, সদ্য অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই কাঁচা সোনাকে দেখিবার নিমিত্ত, আজ তাঁহারাও প্রাণে শ্রদ্ধা লইয়া আসিয়াছেন!

ঐ যে! ঐ যে তিনি আসিতেছেন—ভাবে ডগমগ হইয়া তেমনিভাবে হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন! দেখিতে দেখিতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

"উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে,
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে।
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ,
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন।
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে,
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে।
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস,
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ।

হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্থিরাসনে বসিয়া মৃদু-মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন—"বিপ্রগণ! আপনারা আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না। আমি সত্য সত্যই অপরাধী। এই পাপ কর্ণে কত কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়াছি। সেই পাপেই আমার এই শাস্তি হইয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায় অল্প শাস্তিতেই আমার গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, ইহা আমার পরম সুখেরই কথা।"

"হরিদাস বলেন—শুনহ বিপ্রগণ,
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ।
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিল অপার,
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার।
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ,
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যবন পাইকগণ যখন হরিদাস ঠাকুরকে বন্দী করিয়া লইতে ফুলিয়ায় আসিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারা ঠাকুরের ভজন-কুটীরখানি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ফুলিয়ার লোকেরা তাঁহার ভজনের নিমিত্ত গঙ্গা-পুলিনে একটি সুন্দর গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হরিদাস ঠাকুর কখন কখন বিপ্রগণসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ও অবশিষ্ট কাল সেই নির্জ্জন গোফামধ্যে ভজনানন্দে কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি,
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি।
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে,
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-স্থান ফুলিয়ার সেই গোফার চিহ্ন অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। দেশবিদেশের ভক্তগণ তথাকার ধূলি মস্তকে লইয়া অদ্যাবধি হরিদাস ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন। ফুলিয়া রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ফুলিয়ার ন্যায় কুলীনগ্রামেও ঠাকুর হরিদাসের পাট (ভজন-স্থান) আছে। সে স্থানে প্রতি বৎসর অনন্ত-চতুর্দ্দশীতে মহোৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর যে কোন্ সময়ে কুলীনগ্রামে গিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায় না। কুলীনগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত।

এখন হইতে হরিদাস ঠাকুরের গোফার দ্বারে অতিমাত্র লোকের ভিড় হইতে লাগিল।

অপরাহ্ন হইলেই সকলে আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। শত শত ব্রাহ্মণ-সজ্জন তথায় বসিয়া নামকীর্ত্তন শুনেন, পরে গঙ্গায় সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ সে স্থানে সকলেই একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। লোকেরা আসিয়া বসেন, কিন্তু বেশীক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারেন না; ঠাকুরের কিন্তু কোনও উদ্বেগ নাই। ব্রাহ্মণেরা এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বৈদ্য অর্থাৎ সাপের রোজাগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা নানা গুণ-জ্ঞান করিয়া বলিল যে, গোফার ভিতরে সুড়ঙ্গমধ্যে এক মহানাগ বাস করেন। তাঁহারই বিষের জ্বালায় বাহিরেও এত জ্বালা।

> "বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়,
> মহা এক নাগ আছে, তাহার জ্বালায়।
> রহিতে না পারে কেহ, কহিল নিশ্চয়,
> হরিদাস সত্বরে চলুক অন্যাশ্রয়।"
>
> (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ব্রাহ্মণগণ শশব্যস্তে হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তাঁহাকে তখনই গোফা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এত দিন এ স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও ত কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করি নাই। তবে আপনারা নাকি অসহ্য জ্বালায় ক্লেশ পাইতেছেন, এজন্য আপনাদের অনুরোধে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু অদ্য নহে, কল্য। এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ যে, আপনারা সকলে মিলিয়া একবার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান করুন। তাহাতে হয় ত এই জ্বালা দূর হইতে পারে।"

তখন সকলে মিলিয়া হরিদাস ঠাকুরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া হরিনাম কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দেখিতে দেখিতে এক মহাকায় সর্প গোফার দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে নির্ভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

> "এইমত কৃষ্ণকথা মঙ্গল কীর্ত্তনে,
> থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে।
> হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন,
> মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ।
> মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে,
> দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে।"
>
> (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ইহা অসম্ভব ঘটনা নহে। ফলতঃ আজকালকার দিনেও এই প্রকার ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতকুলপ্রদীপ সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু যখন ঢাকানগরীর উপকণ্ঠস্থ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার ক্ষুদ্র ভজন-কুটীরে একটি বিষধর সর্প বাস করিত। গোস্বামী প্রভু তাহাকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে দুধ-কলা দিতেন। সময় সময় সেই সর্প গর্ত্ত হইতে উঠিয়া কুটীরমধ্যে বিচরণ করিত, এবং কখনও গোসাঞীর ক্রোড়দেশে, কখনও বা তাঁহার জটা বাহিয়া স্কন্ধে ও মস্তকের উপরে যাইয়া উঠিত। গোসাঞী তখন চুপ্‌টি করিয়া রহিতেন। এই অদ্ভুত ঘটনা বহু লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নবদ্বীপেও এক টোল ছিল। অধুনা তিনি তথায় একটি ভক্তি-সভারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিদিন গীতা-ভাগবত পাঠ ও হরিসংকীর্ত্তনে অদ্বৈতভবন মুখরিত হইতেছে। তখন নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। বৃদ্ধ আচার্য্য কয়েকজনমাত্র ভক্ত লইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত এই সভায় ভক্তির চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য (শ্রীবাস নামে পরিচিত) ও তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, আর মুরারি গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, চট্টগ্রামনিবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত এবং শ্রীমান্‌ শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত নিয়মিতরূপে অদ্বৈত-সভায় আসিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রাতে কি সন্ধ্যায় হাতে তালি দিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। এজন্য সমস্ত নবদ্বীপ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত ছিল। হরিদাস ঠাকুর প্রাণে প্রাণে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের প্রাণের সাড়া পাইয়াই যেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন।

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস,
দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ছাড়েন নিঃশ্বাস।
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি,
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপপুরী।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে

হরিদাস ঠাকুর যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, সেই সময়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ যে কি ভাবে কাল কাটাইতেছিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে নবদ্বীপ জ্ঞানের চর্চ্চায় ভারতে অদ্বিতীয় স্থান ছিল। শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে দেশ-বিদেশ হইতে পড়ুয়া আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিত। তখনকার নবদ্বীপ পণ্ডিতের নবদ্বীপ। জ্ঞানের চর্চ্চা বিলক্ষণ হইত। ভক্তির চর্চ্চা ও ভক্তির সাধনাকে পণ্ডিতেরা ভাবুকতার ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষা ও উপহাস করিতেন। তাঁহারা কেহ কেহ গীতা-ভাগবতও পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তির কথা না বলিয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যাই করিতেন। সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিত, কেবল অক্ষরে, কিন্তু ভাব রক্ষা করিতে পারিত না। জাত্যভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল ছিল।

তৎকালে নবদ্বীপে ভক্তির ধর্ম্ম প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি বড় সুকৃতী যিনি, তিনি হয় ত স্নানের সময় দুই একবার গোবিন্দ কি পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেন, এই পর্য্যন্তই। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিয়া যে কয়েকটি বৈষ্ণব নিষ্ঠার সহিত ভক্তিধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত হইতে হইত। 'সোহং' ভাবটা তখন প্রায় সকল লোকের মধ্যেই, প্রাণে নহে, কিন্তু বচনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা বলিতেন, "ব্রহ্ম ত ঘটে পটে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমিই ব্রহ্ম। সুতরাং আবার ডাকিব কাহাকে? এই মূর্খগুলা বৃথা হরি হরি বলিয়া চীৎকার করে কি জন্য? ইহারা সমাজের উপদ্রববিশেষ। ইহাদিগের ঘর-দরজা ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলে তবে এদের উপযুক্ত শাস্তি হয়।"

"বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম,
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়,
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়,
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।
হাতে তালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ,
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন।

তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে?
আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন,
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ?
এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া,
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া।
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্বভক্তগণ,
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

দেশমধ্যে যখন ভক্তির এরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষ, সমস্ত সমাজ যখন তুচ্ছ বিষয়-রসে উন্মত্ত, যখন বিষ্ণুভক্তগণ চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া হাহাকার করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তির বিগ্রহস্বরূপ হরিদাস ঠাকুর আসিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এ দুর্দ্দিনে তাঁহার ন্যায় একজন ভক্তিমান্, শক্তিমান্, সমধর্ম্মী ও ব্যথার ব্যথী পাইয়া ভক্তগণ প্রাণে আশ্বস্ত হইলেন, শ্রীঅদ্বৈত উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার,
হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস,
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ।
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি,
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুরের আগমনের পর হইতে নব উদ্যমে ভক্তিসভার কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিরোধিগণের উপদ্রব কিছুমাত্র কমিল না, বরং বাড়িয়া চলিল। ভক্তবৃন্দ অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে জগতের কল্যাণ-কামনায় দিবানিশি ভূভারহারী ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন এবং আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার অবতরণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

"স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ,
কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গা-স্নান কৃষ্ণের কথন।
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ,
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ।"

এই সময়ে হরিদাস ঠাকুরের বয়স আনুমানিক চৌত্রিশ বৎসর এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বয়ঃক্রম একান্ন বৎসর হইবে। আচার্য্যের এক জ্ঞান, এক ধ্যান—কত দিনে কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া জীবের দুঃখ দূর করিবেন। সেই 'জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যের মুখ্য গুরু' শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণ সঙ্গে নিরবধি কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন, আর, 'তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে' শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আবেশে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতেছেন।

"স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়,
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার,
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে,
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে,
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ইহার প্রায় এক বৎসর কাল পরে চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সিংহ-রাশি সিংহলগ্নে সায়ংকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েন। গ্রহ-ণোপলক্ষে সমস্ত নদীয়ার লোক গঙ্গাস্নানে যাইতে লাগিলেন। দেশবিদেশ হইতেও কত লোক এই শুভক্ষণে শুভযোগে গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছেন, দান করিতেছেন ও গ্রহণ দর্শন করিতেছেন—সকলেই মনের উল্লাসে হরিধ্বনি করিতেছেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনির সহিত লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি মিলিয়া তৎকালে নবদ্বীপে যেন গোলোকের আনন্দ-বৈভব ব্যক্ত করিতেছিল। এই পরম শুভ মুহূর্ত্তে কোটি চন্দ্রের কান্তি ম্লান করিয়া কাঞ্চন-গৌর গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হইয়া শচীমায়ের কোলে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে দশদিক্ প্রসন্ন হইল, স্থাবর-জঙ্গম আনন্দ-শ্রী ধারণ করিল।

"প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল,
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল।"

"সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে,
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।

জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস,
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

ব্রাহ্মসমাজের কথা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ও সাধন

উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর যুক্তিবাদের প্রভাবেই আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়, ব্রাহ্ম-মতবাদের বিচারে এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। এই যুক্তিবাদে যে ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ইংরাজিতে Theism বলা যায় না, Deism'ই বলিতে হয়। এই Theism'এ ও Deism'এ প্রভেদ এই যে, Theism'এ ঈশ্বরের পুরুষবিধত্ব বা Personality'র প্রতিষ্ঠা করে। Deism'এর ঈশ্বরতত্ত্বে এই Personality'র বা পুরুষ-বিধত্বের প্রতিষ্ঠা করে না।

Theism ও Deism এই দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিলাম, কারণ, ইহার কোনও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই; অন্ততঃ আমি জানি না। ভাবটাই নিতান্ত বিদেশী, সুতরাং স্বদেশী ভাষায় তাহার ব্যঞ্জনা না থাকারই কথা। তবে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনে যে একটা Deism'এর আভাস একেবারেই পাওয়া যায় না, তাহা নহে। উপনিষদ যেখানে বলিয়াছেন যে "ব্রহ্ম আছেন"—এইমাত্রই কহিতে পারা যায়, এই ব্রহ্ম কিরূপ বস্তু, তাহার উপলব্ধি কেমন করিয়া হইবে—"অস্তীতি ব্রবীতি কথং তদুপলভ্যতে"; সেখানে এই Deism'এর ভাব কতকটা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন ব্রহ্ম-সাধনের একটা স্তরে অজ্ঞেয়তাবাদের বা agnosticism'এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই অজ্ঞেয়তাবাদ বা agnosticism, সাধনের চরম কথা নহে, মাঝখানের পথের কথা মাত্র। ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা জানি না। তাঁহার সম্বন্ধে কি উপদেশ করিতে হয়, তাহাও জানি না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা—যাঁহারা ব্রহ্মের কথা কহিয়াছেন, তাঁহারা ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

> "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনো,
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
> অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি,
> ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥"—কেন।

ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহাকে জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত

সমুদয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এইরূপই শুনিয়াছি।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব বস্তুতঃ অজ্ঞেয়। আধুনিককালে, ইউরোপে হার্বার্ট স্পেন্সার যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে এই ব্রহ্মতত্ত্বের সাদৃশ্য খুব বেশী। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এইখানে আসিয়াই যদি থামিয়া যাইত, তাহা হইলে, তাহাকে আমরা স্বচ্ছন্দে Deism বলিতে পারিতাম।

এই জন্যই আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ যে ঈশ্বর-তত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের একটা আপাত সজাতীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ ইহার অনেক উপরে যাইয়া, অপরোক্ষ অনুভবেতে যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, অথবা লক্ষ্য করিলেও তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, নিজেদের অন্তরের যুক্তিবাদের প্রেরণায়, উপনিষদ্-ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন। আধুনিক ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। মহর্ষির সময়ে আমাদের নূতন ইংরাজিনবিশ যুক্তিবাদিগণ যে তাঁর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহারও মূল অনেকটা এই-খানেই পাওয়া যায়।

তবে যাঁহাদের অন্তরে একটা প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি প্রবল ছিল, তাঁহারা বাহি-রের মতবাদে এই যুক্তিবাদকে গ্রহণ করিয়াও, নিজেদের ভিতরকার সাধন-ভজনে ইহাকে একান্তই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। মতবাদে ও সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগকে Deist বলিলেও, সাধনে Theist'ই বলিতে হয়। ইঁহারা Personal God'এ আস্থাবান্ ছিলেন। যে-যুক্তিপথে ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নূতন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন, তাহাতে Personal God'এর প্রতিষ্ঠা হয় না। Personal God'কে ঠিক নিরাকার বলা যায় না। বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকার তাঁহার নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু যেখানেই ঈশ্বরতত্ত্বকে আমাদের হইতে আমরা পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করি, যেখানেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে যাই, যেখানেই তাঁহাকে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া, জীব তাঁহার উপাসকের অভিমান করে এবং তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন করিতে যায়, সেখানেই ঈশ্বরের ও জীবের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দাতা, আমি গ্রহীতা। তিনি পাতা, আমি পালিত। তিনি স্রষ্টা, আমি সৃষ্ট। তিনি আশ্রয়, আমি আশ্রিত। ভক্তি-সাধনের এ সকল অঙ্গ যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই ঈশ্বর জীব হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ হইয়া পড়েন এবং এই পার্থক্যের উপলব্ধির জন্য, তাঁহার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য-প্রতিষ্ঠাও প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর এই বৈশিষ্ট্য-প্রতিষ্ঠা করিলেই ঈশ্বরতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় হইয়াও নিতান্ত নিরাকার রহেন না।

ঠিক যুক্তির পথ ধরিয়া চলিলে, নিজেদের সিদ্ধান্তের স্ববিরোধিতা দোষ খণ্ডাইতে হইলে, আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ যে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হয় নিরাকার থাকে না, আর না হয়, Personal God'এর প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

কিন্তু মানুষ, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রাণ লোকে সর্ব্বদা যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন না। নিজেদের সহজ শ্রদ্ধার প্রেরণায়, তাঁহারা সাধন-ভজনে এবং গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ও অনুভবেতে, সর্ব্বদাই নিজেদের সাম্প্রদায়িক মতবাদকে অতিক্রম করিয়া যান। ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই হইয়াছে। এই জন্যই আমরা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে একটা গভীর ও সজীব ধর্ম্মের ও ভক্তির ভাব দেখিয়াছি। কিন্তু এই ভক্তি বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মের প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধিরই ফল; প্রচলিত ব্রাহ্ম-মতবাদে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

রাজার পথ ছাড়িয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে নূতন পথ ধরিলেন, রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়া যে অভিনব সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, তাহার দ্বারা তাঁর নিজের ধর্ম্মজীবনের বিচার করিলে অবিচার করাই হইবে। মহর্ষির প্রকৃতির মধ্যেই একটা বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি ছিল। এই আস্তিক্যবুদ্ধিই তাঁহার নিজের ধর্ম্মজীবনকে আধুনিক যুক্তিবাদ ও *Deism*'এর মধ্যেও অমন সতেজ ও সজীব রাখিয়াছিল। মহর্ষির ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে, যুক্তিপরম্পরায় গঠিত হয় নাই। তাঁহার মধ্যে এই সহজসিদ্ধ শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হইবামাত্রই, তাহার ভিতরকার সত্যটুকু একেবারে ছাঁকিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

এই "ছাঁকিয়া" শব্দটিই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি খাটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মহর্ষি উপনিষদকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া তাঁর ধর্ম্ম গড়িয়া তুলেন। আমি নিজেও বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু কথাটা সত্য নহে। উপনিষদের সকল কথা তিনি গ্রহণ করেন নাই, ইহা সত্য। উপনিষদের নানা স্থান হইতে নানা শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ গঠন করেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু মনকিওর ডি, কনওয়ে যে-প্রণালীতে তাঁর Sacred Anthology প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার পরে ব্রাহ্মসমাজেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে "শ্লোক-সংগ্রহ" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ সে ভাবে রচিত হয় নাই। "শ্লোক-সংগ্রহের" রচনায় ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে বাছাই করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ উপনিষদ খুলিয়া বাছাই করিয়া রচিত হয় নাই।

মহর্ষির ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগিলে পরে, ঘটনাক্রমে ঈশোপনিষদের একখানা ছিন্নপত্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকটি এই :—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; অর্থাৎ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, এরূপ জানিয়া বিষয়-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগের দ্বারা পরমেশ্বরকে সম্ভোগ কর। কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।

মহর্ষির অন্তরে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে নহে; কিন্তু সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে। ইহা ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা নহে, সাধন-জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর আছেন কি নাই, এই ঈশ্বর Personal না Impersonal, তিনি জীবের উপাস্য কি না, এ সকল সন্দেহ দেবেন্দ্রনাথের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে নাই। নশ্বর সংসারে জীব কি করিয়া অমৃততে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কোন্ পথে ঈশ্বরলাভ হয়, এই প্রশ্নই তাঁহার জীবনকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। "ঈশাবাস্যম্" শ্রুতিতে ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার উত্তর নাই। ঈশ্বর আছেন, এই বুদ্ধি বা প্রতীতি যাঁর দৃঢ় নহে, এই শ্রদ্ধা যাঁর অচলা নহে,—তাঁহার নিকটে "ঈশাবাস্যম্" শ্রুতির কোনও মূল্য নাই। যিনি ঈশ্বর আছেন, ইহা জানেন; কিন্তু এই ঈশ্বরকে প্রাণ দিয়া ধরিতে পারিতেছেন না বলিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁর নিকটেই "ঈশাবাস্যম্" শ্রুতির মূল্য আছে। মহর্ষির তখন এই অবস্থাই ছিল। এই জন্যই এই ছিন্ন পত্রখানি তাঁহার জীবনে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিল। তাঁর প্রিয়তমের সন্ধান দিয়াছে বলিয়া, তখন হইতে তিনি উপনিষদপাঠে নিবিষ্ট হইয়া গেলেন।

যখন এই ভাবে আমরা কোনও শাস্ত্রাদি পড়িতে যাই, তখন আমাদের মন স্বভাবতঃই যাহা মনোমত হয়, তাহাই প্রাণের ভিতরে পূরিয়া লয়, যাহা মনে লাগে না, তাহা আপনা হইতেই বাহিরে পড়িয়া থাকে। কিছু দিন পরে দেখা যায় যে, সেই সকল অধীত শাস্ত্রের বা গ্রন্থের যে-অংশ প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহাই কেবল মনে আছে, বাকি সবটা ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথেরও তাহাই হইল। উপনিষদের যে সকল শ্রুতি তাঁর প্রাণের ভিতরে আট্‌কা পড়িয়াছিল, সেগুলিই তাঁর চিন্তার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া, তাঁর নিজের ভাবের বাহন হইয়া পড়িল। এই সকল ভাব যখন তিনি ব্যক্ত করিতে গেলেন, তখন উপনিষদের শ্রুতিগুলি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়া নহে, কিন্তু তাঁর মন হইতেই ফুটিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবেই তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থখানি রচিত হয়। এ সকল শ্রুতি-মন্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথকে শ্রুতিধর বলা যায় না, মন্ত্র-দ্রষ্টাই বলিতে হয়। এই ভাবেই তাঁহার ঋষি-উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থে উপনিষদের যে সকল শ্রুতির অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা তাঁহার অধ্যয়নের ফল নহে, সাধনের ফল। আর মানুষ অন্তরঙ্গ-সাধনের ফলে যাহা লাভ করে, তাহা সর্ব্বদাই তাহার মানসিক মতবাদাদিকে উপেক্ষা ও অতিক্রম করিয়া যায়। এই সাধনলব্ধ বস্তুর সঙ্গে এ সকল মতবাদের সঙ্গতি রহিল কি না, সাধক অনেক সময় ইহাও বিচার করিয়া দেখেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও তাহাই হইল। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ-অধ্যাত্ম-সম্পদের সঙ্গে বাহিরের মতবাদ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গতি বা সমন্বয়-সাধনের কোনওই চেষ্টা করিলেন না। ইহার মধ্যে যে কোন অসঙ্গতি আছে, তাহা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন কি না, সন্দেহ। সুতরাং তিনি নিজের সাধনের দ্বারা যাহা পাইলেন, তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাহার সন্ধান পাইলেন না। ব্রাহ্ম-সমাজ এই জন্য মহর্ষির বাহিরের মতবাদেতেই আটকাইয়া গেল। ব্রাহ্ম-সমাজ মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে যেমন রাজার পথ ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ পরে অন্তরঙ্গ-সাধনে মহর্ষির প্রত্যক্ষ পথ-টিও ধরিতে পারিল না। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে মহর্ষি যে মতবাদ ও সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মগণ তাহাকে ধরিয়াই পড়িয়া রহিলেন।

এমন কেন হইল? ইহার প্রথম হেতু এই যে, সে সময়ে বাঙ্গালার নূতন শিক্ষিত-সমাজে উপনিষদ্ধর্ম্মের কোনওই আলোচনা ছিল না। ইঁহারা তখন ইউরোপীয় চিন্তার মোহে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদিতেই ভোরপূর ছিলেন। এই সমাজে সংস্কৃতের ত কথাই নাই, বাঙ্গালার পর্য্যন্ত কোনও চর্চ্চা বা মর্য্যাদা ছিল না। উপনিষদাদির প্রতি কোনওই শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা ছিল না বলিয়া উপনিষদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের অধিকারও জন্মায় নাই। সুতরাং মহর্ষির উপদেশাদির দ্বারা ইঁহারা উপনিষদের সাধনমার্গে কোনও দীক্ষালাভ করিলেন না। উপনিষদের সাধন-পথে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সাধারণে তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন না।

মহর্ষির সাধনের আরও একটা গভীরতর স্তর ছিল সেটি ভক্তির স্তর। জ্ঞানের দিক্ দিয়া মহর্ষির সাধন যেমন কতকটা উপনিষদের পথ ধরিয়াছিল, ভক্তির দিক্ দিয়া সেই-রূপ মুসলমান ভক্ত-কবিদিগের পথ ধরিয়াছিল। একদিকে যেমন উপনিষদের শ্রুতি দেবেন্দ্র-নাথের তত্ত্বজ্ঞানের বাহন হইয়াছিল, অন্যদিকে সেইরূপ হাফেজ, সাদি প্রভৃতির কবিতা তাঁহার ভক্তির বাহন হয়। গভীর জ্ঞানের কথা কহিতে গেলেই দেবেন্দ্রনাথ উপনিষ-দের শ্রুতির আবৃত্তি করিতেন। আবার উচ্ছ্বসিত ভক্তির কথা বলিতে গেলেই ভাবে গদগদ হইয়া ফার্সি কবিতার আবৃত্তি করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যেমন উপনিষদ, সেইরূপ হাফিজ, সাদি প্রভৃতিও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিতান্ত অপরিচিত ছিল। মহর্ষির অন্তরঙ্গ

সাধনের যে দুইটি প্রধান বাহন ছিল, তাঁর একটিও তাঁর শিষ্যবর্গের আয়ত্তাধীন ত হয়ই নাই, পরিচিত পর্য্যন্ত ছিল না। আর এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের বহির্বাটিকার বহিরঙ্গনের চরম সীমান্তের মানসিক মতবাদের জঞ্জালেই বাঁধা পড়িয়া রহিল, মণিকোটা ত দূরের কথা, অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিল না।

দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি, তাহার প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন নহেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এই মতবাদ ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, এই যুক্তিবাদেরই আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজিনবিশদিগের মধ্যে, বিদেশীয় শাস্ত্র সাহিত্যাদির অধ্যয়ন ও আলোচনা নিবন্ধন যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল, মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তাহারই একটা মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিল। এই ইউরোপীয় যুক্তিবাদ দুই পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। এক পথ জড়বাদে যাইয়া পৌছায়। এই পথের চরম সীমা সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্যে সূক্ষ্ম জড়ের প্রতিষ্ঠা। জড় ও জীব, শরীর ও মন, চেতন ও অচেতন ;—সকলই জড়ের বিচিত্র বিকারমাত্র। জড় ছাড়া বিশ্বে দ্বিতীয় তত্ত্ব বা বস্তু নাই। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর যুক্তিবাদের এক শাখা এই Materialism বা জড়বাদ। ইহার অন্যতর শাখা একপ্রকারের আইডিয়ালিজম্ বা ভাব-বাদ। এক শাখা যেমন বলিলেন, জড় ছাড়া আর অন্য বস্তু নাই ; অপর শাখা সেইরূপ বলিলেন, আইডিয়া বা ভাব ছাড়া অন্য বস্তু নাই। শব্দস্পর্শরূপরসাদিই ত জড়ের লক্ষণ। কিন্তু শব্দাদি ত কেবল সচেতন জীবের অনুভব মাত্র। এই অনুভূতি ছাড়া, এই অনুভবের বাহিরে শব্দাদিলক্ষণযুক্ত কোনও কিছু স্বতন্ত্র বস্তু আছে, তাহার প্রমাণ কৈ ? ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর যুক্তিবাদের গোড়া হইতে এই দুইটি কাণ্ডের বা শাখারই প্রকাশ হয়।

এই দুইটি শাখাই আমাদের নূতন ইংরাজিনবিশদিগের মধ্যে প্রকট হয়। এক দল 'নাস্ত্যদস্তীতিবাদী' হইয়া পড়েন। এই দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া বা ইহার অন্তরালে কি মূলে যে আর কোনও একটা অদৃশ্য কিছু আছে, ইহাঁরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। আর একদল নিতান্ত ভাববাদী হইয়া উঠেন। ইহাঁদের নিকটে ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি কেবল ভাবমাত্র হইয়া উঠে। এই ভাবমাত্র বস্তুকেই ইংরাজিতে abstraction কহে। এই দলের নিকটে ঈশ্বর, জীবাত্মা, পরলোক প্রভৃতি স্বল্পাধিক abstraction-রূপেই প্রতীত হয়। এই abstractionটাই ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তকে অলক্ষিতে গ্রাস করিয়া বসে। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর যুক্তিবাদের পরিণাম এইভাবে প্রকাশিত হয় ; যথা—
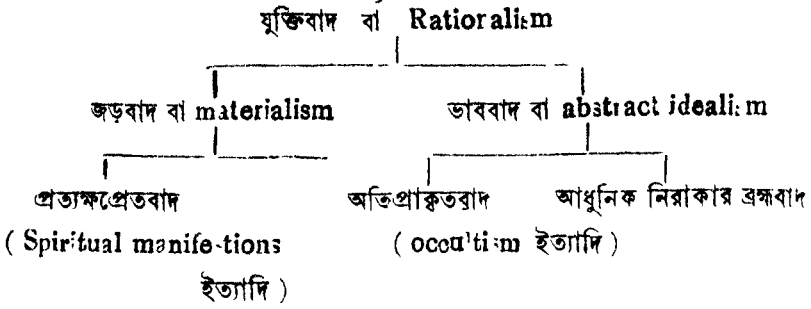
একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রত্যক্ষপ্রেতবাদ, অতিপ্রাকৃতবাদ প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন জড়বাদ বই আর কিছুই নহে। ইহাঁরা একপ্রকার অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু যে তত্ত্বের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, তাহাকে সত্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলা যায় কি? পরলোক আছে, আত্মা মরে না, শ্মশানের ভস্মমুষ্টিতেই মানুষের শেষ হয় না, ইহার পরেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে। প্রমাণ? না, মরা মানুষ আবার দেখা দেয়, কথা কয়, এমন কি, তার আলোকচ্ছবি বা ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলিয়া লইতে পারা যায়। এ সকল ঘটনা সত্য হইতে পারে। এ সকল ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেই, প্রচ্ছন্ন-জড়বাদী হওয়া যায় না। কিন্তু এ সকলকে পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেই, অর্থাৎ এ প্রমাণ না পাইলে যারা পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, বা এরূপ প্রমাণ পাইবার পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারে নাই—তারাই প্রচ্ছন্ন-জড়বাদী। এইরূপ occultsmএর উপরে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতেও এই জড়বাদ লুকাইয়া থাকে।

অন্যদিকে নিরাকার ব্রহ্মবাদ ও abstractidealism এরই নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র। আমাদের প্রাচীনেরা ইহাকেই শূন্যবাদ কহিতেন। শাঙ্কর-বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মবাদের উপরেও এই "প্রচ্ছন্ন-শূন্যবাদ" আরোপিত হইয়াছে। সকল প্রকারের সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া, আমাদের আধুনিক ব্রহ্মবাদকে নির্ম্মম যুক্তির ছুরিকা দিয়া নিঃশেষ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করিলে, তাহার অন্তস্তলেও এই শূন্যবাদ ও ভাববাদ বা abstraction মাত্র পাওয়া যায়। এই জন্য আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের মামুলী মতবাদে ও সাধনে এ পর্য্যন্ত কোনও সত্য বস্তুতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-জীবনকে মামুলী ব্রাহ্ম-মতবাদ বা সাধনের দ্বারা বিচার করা যায় না। প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধির প্রভাবে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ-সাধনে ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় একটা বস্তুসাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সূত্রে এটি লাভ করেন ও যে বাহন অবলম্বনে পরিণত বয়সে এই গভীর সাধনাভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে ব্যক্ত করিতেন, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সাধারণের কোনও

সাক্ষাৎ, এমন কি, অপরোক্ষ পরিচয়ও ছিল না। সুতরাং ইহাঁরা মহর্ষির আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিলেন না। দেশের লোকেও সে সম্পদের প্রত্যক্ষ সন্ধান পাইল না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সংস্কারের প্রভাব

(১)

"ভবানি, মা !"

পিতার আহ্বান শুনিয়া আনন্দ-লতিকার মত হাস্যময়ী বালিকা সাজি-হস্তে দ্রুতপদে সেখানে আসিল। মধুর হাস্যে বালিকা বলিল, "আপনি আমায় ডাক্‌ছেন, বাবা ?"

"হাঁা, মা, একবার ওঁকে ডেকে আন ত ?"

বালিকা তেমনই লঘুগতিতে চলিয়া গেল। বেদান্তবাগীশ, নিমগ্ন-দৃষ্টিতে কন্যার প্রতি চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাই ত! সত্যই আর ভবানীকে ত ঘরে রাখা যায় না! কন্যাকে ত তিনি প্রত্যহই দেখেন, সর্ব্বদাই সে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে "সঞ্চারিণী লতার" ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সে যে ক্রমশঃ নারীত্বের গৌরবের পথে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে—কোনও দিন সে কথা ত তাঁহার মনে হয় নাই! গৃহিণী কতবার তাঁহাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ তখন সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। বারো বছরের মেয়ে, এখনই এত তাড়াতাড়ি কি ? হিন্দুর ঘরে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে এত বড় মেয়ে অবিবাহিত থাকা বিস্ময়ের বিষয় হইলেও, তারানাথ বেদান্তবাগীশ স্নেহবশতও বটে এবং আজকালকার আব-হাওয়ার জন্যও কতকটা বটে, মেয়েকে তাড়াতাড়ি পরের ঘরে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু শরতের মধুর প্রভাতে পুষ্পপূর্ণ সাজিহস্তে আজ যখন শারদ-লক্ষ্মীর মত সে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সত্যই বেদান্তবাগীশের মনে হইল, না, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। একমাত্র সন্তান, নয়নের পুত্তলি ও স্নেহের রত্ন হইলেও তাহাকে পাত্রস্থ করিবার সত্যই সময় উপস্থিত।

নিবিষ্ট-মনে ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। স্বামীকে অন্যমনস্কভাবে একদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি ভাব্‌ছো ?—হাঁা গা, তুমি আমায় ডেকেছ ?"

ব্রাহ্মণ, পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হাঁা, আমি এখনই একবার পরাণপুর যাবো। ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হবে। ভাল কথা, তুমি ঠিক্ বলেছিলে, মেয়েকে আর ঘরে রাখা যায় না। এবার ওকে পাত্রস্থা না কর্‌তে পার্‌লে আর চল্‌ছে না।"

বেদান্তবাগীশ-পত্নী স্বামীর দিকে গাঢ় দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তবু ভাল। কিন্তু এত দিন পরে হঠাৎ এ কথাটা মনে হ'ল কেন বল দেখি?"

"না, মা লক্ষ্মীর জন্য এবার পাত্র স্থির করিতেই হইবে।"

বেদান্তবাগীশ আর দাঁড়াইলেন না। উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া তিনি বহির্বাটীর দিকে চলিলেন। আজ কন্যার জন্য বাস্তবিকই তাঁহার মনে বিপ্লব বাধিয়াছিল। বহির্বাটীর বিস্তৃত আটচালায় প্রবেশ করিতেই কয়েকটি তরুণ ব্রাহ্মণ-কুমার ত্বরিতপদে তাঁহার সম্মুখীন হইল। অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভবতারণ, আজ তোমাদের পাঠের কিছু অসুবিধা হইবে। আমি পরাণপুর যাইতেছি, এ বেলা ফিরিতে পারিব না। তুমি হরিশ, উপেন, যতীন্দ্র প্রভৃতির পাঠে যতটা পার, সহায়তা করিও।"

ভবতারণ গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞা।"

তখন অন্যান্য ছাত্রদিগকে ভাবতারণের আদেশ মান্য করিবার জন্য মিষ্টভাবে উপদেশ দিয়া বেদান্তবাগীশ উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ছাত্রগণ স্ব স্ব স্থলে বসিয়া পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিল। ভবতারণও নিজের স্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

(২)

তারানাথ বেদান্তবাগীশ সুপণ্ডিত। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন রীতিনীতি ও কুলপ্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। অর্থাৎ সংস্কৃত-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াও পৈতৃক ব্যবসায় বা কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পাঠশেষে স্বগ্রামে আসিয়া পিতার টোলের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামে তাঁহাদের ছয় পুরুষ ধরিয়া বাস। সেই সময় হইতেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত টোলের প্রতিপত্তি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক ছাত্রকে তাঁহারা প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, বিদ্যাদানে প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তারানাথও বিংশ শতাব্দীর দারুণ জীবন-সংগ্রামের যুগেও পূর্ব্বাচরিত কুলপ্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জন হ্রাস পাইলেও ব্রহ্মোত্তর জমীর আয় ও পণ্ডিত-বিদায়ের উপার্জ্জন হইতে তিনি চারি পাঁচটি দরিদ্র ছাত্রকে স্বগৃহে রাখিয়া তাহাদের অশন-বসন যোগাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিতেছেন। কুলপ্রথা ভঙ্গ করাকে তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন।

পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয়-বান্ধব-বর্জ্জিত ভবতারণ কাব্যবিনোদ উপাধিলাভের পর দর্শনশাস্ত্র পাঠের জন্য যখন বেদান্তবাগীশের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহার বয়স আঠারো বৎসর। আজ সাত বৎসর সে এই টোলে অধ্যয়ন করিতেছে। বেদান্তবাগীশ

এই সরল-হৃদয়, বলিষ্ঠ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমারকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন বর্ত্তমানে সেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র। সংসার সম্বন্ধে ভবতারণের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। শাস্ত্রচর্চ্চার দিকে তাহার যতটা অনুরাগ ছিল, বিংশ শতাব্দীর নানা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সে তেমনই অনভিজ্ঞ ছিল। সংসারের নানা প্রকার কূটনীতির সমস্যাসমাধানে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি আদৌ হইত না। এ জন্য একান্ত সরলচিত্ত এই যুবকের প্রতি তারানাথ বেদান্তবাগীশের স্নেহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যান্য ছাত্র বৎসরে দুই একবার করিয়া নিজ নিজ গ্রামে গিয়া পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিয়া আসিত। কিন্তু ভবতারণের কোথাও যাইবার স্থান ছিল না। গৃহ বলিতে তাহার বেদান্তবাগীশের গৃহই বুঝাইত। তাহার আত্মীয়-স্বজনের স্থান তিনিই পূরণ করিতেন। বেদান্তবাগীশের পত্নীও এই আত্মীয়-স্বজনহীন যুবকটিকে ঘরের ছেলের মতই ভাবিতেন।

ভবানী বাল্যকাল হইতে ভবতারণের নিকট মাঝে মাঝে পাঠ বলিয়া লইত। বেদান্তবাগীশ নিজেই কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় কার্য্যোপলক্ষে তিনি অন্যত্র যাইতেন, তখন ভবতারণের উপরই তাহার শিক্ষার ভার পড়িত। বালিকা ভবানী, কাব্যবিনোদ উপাধিধারী শান্তশিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুমারের কাছে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবাধে পাঠ বলিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ দুই বৎসর হইতে সে আর বহির্ব্বাটীর টোলে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে আসিত না। সাংসারিক কর্ম্মে মাতার সহায়তা ছাড়া আজ কার্ত্তিকমাসের ব্রত, কাল শিবপূজা প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রত ও পূজা-অর্চ্চনা লইয়া সে ইদানীং এত বিব্রত ছিল যে, ছাত্রীর ন্যায় নিয়মিত পাঠাভ্যাসে তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহও ছিল না, সময়ও হইত না। শুধু মধ্যাহ্নে সে মাতার তাড়নায় খানিক বই লইয়া বসিত, তখন বেদান্তবাগীশ তাহার পাঠে সহায়তা করিতেন।

ভবানী, পিতার টোলের ছাত্রগণকে দেখিয়া যে বিশেষ লজ্জা করিয়া চলিত, তাহা নহে। কারণ, লজ্জা করিবার মত জ্ঞান অথবা বয়স হইলেও আহারের সময় সকলকে মাতার সহিত তাহাকেই আহার্য্য-দ্রব্যাদি দুই বেলা পরিবেশন করিতে হইত। তাহা ছাড়া বহুদিন হইতেই পিতৃ-ছাত্রগণকে সে দেখিয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে সকলের সঙ্গে বসিয়া একত্র পাঠাভ্যাসও করিয়াছে, কাজেই লজ্জা করিবার অবকাশ তাহার ছিল না। তবে সকলকে সে সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখিত। বিশেষতঃ ভবতারণ কাব্যবিনোদকে সে সর্ব্বাপেক্ষা সমীহ করিত। দীর্ঘকাল এই তরুণ ব্রাহ্মণ-কুমার তাহাদের গৃহে থাকা সত্ত্বেও, গম্ভীর স্বভাব বশতঃ সে ভবানীর অন্তরে তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবেরই সঞ্চার করিবার অবকাশ দিয়াছিল। কাজের কথা ছাড়া সে বেশী কথা কোনও দিন কাহারও সঙ্গে বলিত না। সারা দিনই নিজের গ্রন্থপাঠ লইয়াই সময় অতিবাহিত করিত।

কাব্যপাঠ এবং দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কোনও প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য আছে, ভবতারণ তাহা জানিত কি না বলা যায় না, কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। এ জন্য শুধু ভবানী নহে, টোলের অন্যান্য ছাত্র এবং গ্রামবাসিগণ পর্য্যন্ত ভবতারণ কাব্যবিনোদকে পৃথিবীর যোগ্য জীব বলিয়া মনে করিত না।

ভবতারণকে কেহ কোন কার্য্য করিতে বলিলে, বিনা প্রতিবাদে সে তাহা সম্পন্ন করিত; কখনও সে প্রশ্ন করিত না বা কৈফিয়ৎ চাহিত না। পরিশ্রমে তাহার ক্লান্তি নাই, কিন্তু স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কোন কাজ করিবার ইচ্ছা সে কখনও প্রকাশ করিত না। ব্রাহ্মণ-সন্তানের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সে যথানিয়মেই প্রতিপালন করিত, সে বিষয়ে তাহার কোনও ত্রুটি ছিল না। বরং এ সকল বিষয়ে তাহার নিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে তাহার আসক্তির অভাব দেখিয়া বেদান্তবাগীশ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। সংসারে অর্থোপার্জ্জন বা অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সে যে কোনও দিন দশ জনের একজন হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা তাহার ব্যবহারে আদৌ প্রকাশ পাইত না। সম্ভবতঃ সংসারে কোনও বন্ধন ছিল না বলিয়াই তাহার ব্যবহারে এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইত। অন্ততঃ বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় সেইরূপ মনে করিতেন।

কেহ ভবতারণকে এ বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলে, সে মধুর হাস্য করিয়া পুনরায় আপনার পাঠে মনোনিবেশ করিত। কিছুতেই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না।

(৩)

পূজার তখনও অনেক বিলম্ব আছে। সে দিন শরতের আকাশে বর্ষণ ক্ষান্ত; মেঘের দল দ্রুত চলা-ফেরা করিতেছিল। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। গাছপালাগুলির পাতা বহিয়া তখনও টুপ্‌টাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে পশ্চিম-গগনপ্রান্ত-লীন মেঘের অন্তরাল হইতে সায়াহ্নের ম্লান সূর্য্য উঁকি মারিতে-ছিল। তাহাও মুহূর্ত্তের জন্য। টোলের অন্যান্য ছাত্র অগ্রেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ভবতারণ পুঁথিগুলি যথাস্থানে রাখিয়া উত্তরীয়খানি স্কন্ধে লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। সে একাই বেড়াইত। দলে পড়িয়া খুব একটা হৈ-চৈ করা তাহার স্বভাব ছিল না। প্রত্যহ সকালে ও অপরাহ্ণে সে গ্রামের নদীতীরে গিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পন্ন করিত। এটা তাহার বহুদিনের অভ্যাস। জল-ঝড় অথবা বিশেষ কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ঘটিলেও সে এই নিত্যকর্ম্মে অবহেলা

করিত না। এ জন্য গ্রামের অনেকেই তাহাকে বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। কিন্তু ভোলানাথের ন্যায় নির্ব্বিরোধ ভবতারণ সে সকল বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়াই চলিত।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় কোনও বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে আজ কয়দিন কলিতাতায় গিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভবানীর বিবাহ-সম্বন্ধের চেষ্টাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ভবতারণ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় আলুলায়িতকুন্তলা ভবানী চপল-চরণে পাড়ার কোনও বাড়ী হইতে বেড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

ভবতারণ অন্যমনে আটচালা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বৃষ্টিতে সে স্থানটা কিছু পিচ্ছিল হইয়াছিল, ভবতারণের খড়ম হঠাৎ সরিয়া গেল, বেচারা তাল সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল।

সে দৃশ্যে মানুষের মনে সহানুভূতির সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। ভবানীর মনে হয় ত সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু বলিষ্ঠ যুবক পড়িয়া গিয়াছে, এ দৃশ্যে বালিকা উচ্ছ্বসিতরবে হাসিয়া উঠিল। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ হাস্য অস্বাভাবিক নহে।

ভবতারণের গৌর মুখমণ্ডল লজ্জায় অকস্মাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ব্যথা অবশ্যই দেহে লাগিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে বেদনার যন্ত্রণা চাপিয়া তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার এমনই অদৃষ্ট, সে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনই তাহার উত্তরীয়-খানি পায় জড়াইয়া পিচ্ছিল পথে আবার পড়িয়া গেল।

এবার কোনও মতে হাসি চাপিয়া ভবানী সেখানে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কাব্যবিনোদ ম'শায়, বড় লেগেছে ?"

ভবানী তাহার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে নাম ধরিয়া ডাকিত না; "কাব্যবিনোদ" উপাধি ধরিয়া সম্বোধন করিত। বেদান্তবাগীশ ও তাঁহার পত্নী ব্যতীত সকলেই ভব-তারণকে এই নামে সম্বোধন করিত। "কাব্যবিনোদ" শব্দটি একটু দীর্ঘ করিয়া টানিয়া গ্রামের কোন কোন রসিক ব্যক্তি ভবতারণের প্রতি একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিত; কেহ কেহ "কাব্যচঞ্চু" বলিয়াও ডাকিতে ছাড়িত না। ভবানী সেরূপ কোনও বিদ্রূপ প্রকাশের জন্য "কাব্যবিনোদ" বলিত না, ইহা ঠিক। কারণ, ভবতারণ দীর্ঘকাল তাহার শিক্ষকপদেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রশ্নের মধ্যে সমবেদনার সুর প্রচ্ছন্ন ছিল কি না, বলা যায় না। তবে বিদ্রূপ যে ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু ভবতারণ, উচ্ছ্বসিত হাস্যধারার পরও ভবানীর নিকট হইতে এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশেষ যে লজ্জিত হইয়াছিল, তাহার আরক্ত মুখকান্তি দেখিয়া তাহা যে কেহ বুঝিতে পারিত।

কিছুই ঘটে নাই, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া ভবতারণ এবার সাবধানতা সহকারে

উঠিয়া দাঁড়াইল। 'না, কিছু হয় নাই, ব্যথা লাগে নাই' বলিলেও ভবানী সহসা ভব তারণের দক্ষিণ-চরণের জানুর নিম্নে একটা রক্ত-রেখা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কোনও তীক্ষ্ণমুখ ইষ্টক অথবা তদ্রূপ আর কোনও পদার্থে লাগিয়া ভবতারণের পায়ের খানিকটা মাংস কাটিয়া গিয়াছিল। পরিধেয় বসনের নিম্নভাগ রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবতারণ এতক্ষণ আহত স্থলটি দেখিতে পায় নাই, কিন্তু রক্তরঞ্জিত স্থলটি দেখিয়া একটা ব্যথা-ভরা সমবেদনার ধ্বনি যখন ভবানীর মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বাস্তবিকই ভবতারণের মস্তক যেন লজ্জায় আরও নত হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি আহত স্থলটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ও কিছু হয় নি। একটু আঁচড় লাগিয়াছে।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভবানী তখন দৃঢ়স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, কাব্যবিনোদ ম'শায়। আপনি ঘাটে যাবেন না, আমি আস্‌ছি।" বলিয়াই বালিকা দ্রুত ও লঘু গতিতে অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বালিকার কথা ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার শক্তি ভবতারণের অন্তর্হিত হইল। সে নীরবে সেই অবস্থায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভবানী খানিকটা ন্যাক্‌ড়া ও গাঁদা-গাছের কতকগুলি পাতা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ভবতারণের নিষেধ না মানিয়া সে যখন তাহার আহত স্থলে পটী বাঁধিয়া দিতে উদ্যত হইল, তখন যদি কেহ ভবানীর মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, বালিকাসুলভ চপলতার পরিবর্ত্তে তাহার আননে সেবাপরায়ণা প্রবীণা গৃহিণীর মাতৃমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব ও অঙ্গুলির সাহায্যে সে আহত স্থলটি বাঁধিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবতারণের মুখের দিকে না চাহিয়াই সে বলিল, "আজ আপনি কোথাও যাইবেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক পুকুর-পাড়ে বসিয়া শেষ করুন।"

কথাগুলি আদেশসূচক নহে; কিন্তু ভবতারণ গুরুকন্যা ও শিষ্যার কথাগুলি উপেক্ষা করিয়া আজ সত্যই আর নদীতীরের অভিমুখে গেল না। আহত স্থলের বেদনা বোধ হয়, তাহাকে আজ নিয়মিত অনুষ্ঠান-প্রতিপালনে অশক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবনত-মস্তকে সে ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। তার পর মেঘনম্র আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল।

দূরে পল্লীর দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। আত্মবিস্মৃত ভবতারণ তখন চমকিয়া উঠিল। তার পর সন্ধ্যাবন্দনায় মনোনিবেশ করিল।

(৪)

"সে ত অনেক টাকা পড়িবে?"

পত্নীর প্রশ্নে বেদান্তবাগীশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা ত লাগিবেই। পাশ করা

ছেলের দর কিছু বেশী। আমি সেজন্য প্রস্তুতও হইয়াছি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা গেল, ঠিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে যজন-যাজন-ব্যবসায়ীর হস্তে মেয়ে দিলে সুখের হইবে না। এ ব্যবসায়ে উদরের অন্নসংস্থান করাই সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র সন্তান ভবানীকে আর আমাদের মত অবস্থায় ফেলিতে ইচ্ছা নাই।"

বেদান্তবাগীশের পত্নীরও মনোগত অভিপ্রায় অনেকটা সেইরূপ ছিল। জামাই ইংরাজী-পড়া, পাশ-করা হইবে। নেহাৎ চাল-কলা-বাঁধা ব্রাহ্মণ-সন্তানের ঘরে একমাত্র কন্যাকে প্রাণ ধরিয়া সমর্পণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

বেদান্তবাগীশও অনেক দেখিয়া শুনিয়া কন্যাকে সুখী করিবার জন্য অবশেষে কলিকাতাবাসী কোনও ভদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের সহিত ভবানীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। পাত্রটি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিল, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নহে। পাত্রের পিতা কোনও গবর্ণমেণ্ট আফিসে তিন শত টাকা বেতনে কার্য্য করেন। কলিকাতায় নিজের বাড়ী, ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও আছে। বেদান্তবাগীশ দেখিলেন, এরূপ গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যা পরম সুখেই থাকিবে। তিনি যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধটি ঠিক সেইরূপ। পাত্রের পিতা বেদান্তবাগীশের নাম ও যশঃ শ্রুত ছিলেন। বংশমর্য্যাদা, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-গৌরবে বেদান্তবাগীশ দেশের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। কলিকাতাবাসী হইয়াও পাত্রের পিতার নিকট সে কথা গোপন ছিল না। সুতরাং তিনিও বেদান্তবাগীশের একমাত্র কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। প্রাপ্যগণ্ডা সম্বন্ধে বেদান্তবাগীশের নিকট হইতে তিনি যথেষ্টই লাভ করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার ছিল। বহু রাজা, মহারাজ এবং ধনী ও জমীদার বেদান্তবাগীশের শিষ্য ছিলেন, সে কথা তিনি জানিতেন। একমাত্র কন্যার বিবাহে তারানাথ বেদান্তবাগীশ যে কৃপণতাও করিবেন না, সন্ধান লইয়া তাহাও তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন।

আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই শুভদিন দেখিয়া বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল। বেদান্তবাগীশ কথা পাকা করিয়াই আসিয়াছিলেন। পাত্রপক্ষ ইতিমধ্যে মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন।

একমাত্র সন্তানকে এইবার পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। আর বড় বিলম্ব নাই। নানা শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইলেও তারানাথ বেদান্ত-বাগীশের মনে মায়া প্রভাব বিস্তার করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ব্রাহ্মণীর সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে স্নেহের ব্যথা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। এত কাল পরে এইবার মেয়েটিকে জন্মের মত পরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে! এত দিন যাহাকে সযত্নে লালন-পালন করিয়া এত বড় করা গিয়াছে,

সে পরের হইয়া যাইবে, আর তাহার উপর কোন অধিকার থাকিবে না! এমন অনেক কথাই মনে উদিত হইতেছিল।

ব্রাহ্মণী খানিক পরে বলিলেন, "আচ্ছা, সেখানে আমার ভবানী বেশ সুখে থাকিবে, না?"

চিন্তাটাকে সরাইয়া দিয়া বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "তা থাকিবে বৈ কি। তাঁদের অবস্থা ভাল। ঐ একটিমাত্র ছেলে। টাকা-পয়সার অভাব নাই। লেখা-পড়ায় ছেলেটি ভাল, কুড়ি টাকা করিয়া জলপানি পাইতেছে। বাড়ীতে চাকর, ব্রাহ্মণ, সবই আছে। ভবানীকে বিশেষ কোন কাজ করিতে হইবে না। আর লোকও তাঁরা খুব ভদ্র। আমার ত মনে হয়, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইলেও এমন উপযুক্ত পাত্র আমি হাত-ছাড়া করিব না।"

আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেদান্তবাগীশের পত্নী বলিলেন, "না, না, এমন পাত্র কি ত্যাগ করিতে আছে? মা আমার লক্ষ্মী-প্রতিমার মত তাঁদের ঘরে গিয়ে সুখে থাক্‌বে। যে শুন্‌ছে, সেই বল্‌ছে, খুব ভাল সম্বন্ধ হয়েছে।"

"সুখে থাক্‌বে বলেই চেষ্টা করা। এখন ভগবানের ইচ্ছা আর আমাদের কর্ম্মফল।"

বেদান্তবাগীশ নস্যের ডিবাটা লইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

(৫)

বাহিরের আটচালার অনতিদূরে একটি বংশ-নির্ম্মিত মঞ্চের উপর নহবৎ বসিয়াছিল। বেদান্তবাগীশের বিস্তৃত বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান সুপরিষ্কৃত হইয়াছে। ঘরগুলি গোময়-লিপ্ত হইয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া হাসিতেছিল। বাহিরের প্রকাণ্ড আটচালার চাল নূতন উলুখড় দ্বারা ছাওয়া হইয়াছে। কয়েকখানি নূতন বড় বড় ঘরও নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ, সুতরাং সকল রকমেই তিনি উপযুক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। কল্য বিবাহ। আজ বিবাহবাটী আত্মীয়বন্ধুবান্ধবে ভরিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বর ও বরযাত্রী আসিবে। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছিল। দোকানের প্রস্তুত কোন দ্রব্য বেদান্তবাগীশ ব্যবহার করিতেন না। কন্যার বিবাহে তিনি বাড়ীতেই সকল প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের আয়োজন করিয়াছিলেন।

টোলের ছাত্রগণ কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতেছিল, ভবতারণ কাব্যবিনোদ। আজ তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। গুরু-কন্যা এবং শিষ্যার বিবাহ, সে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নানাপ্রকার ফরমাস খাটিতেছিল। অধিক কথা বলার অভ্যাস তাহার নাই, সে শুধু কাজ করিয়া যাইতেছিল। ভিয়ান-ঘরে মণ্ডা-মিঠাই প্রস্তুত হইয়া গেলে, সে উহা পাত্র-পূর্ণ করিয়া ভাণ্ডার-ঘরে তুলিয়া রাখিতেছিল।

বেদান্তবাগীশ এ সকল কার্য্যের ভার তাহাকেই দিয়াছিলেন। সকলকেই বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাপু, এ সব তোমাদের কাজ, যশ অপযশ সবই তোমাদের। সুতরাং আমার আর কিছু বলিবার নাই।" ছাত্রগণ সকলেই প্রাণ ভরিয়া পরিশ্রম করিতেছিল। গাড়ী-বোঝাই তরী-তরকারী আসিতেছিল, ছাত্রগণ অমনই তাহা যথাস্থানে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিল। যেখানে যখন যে কার্য্যের প্রয়োজন হইতেছিল, অমনই ভবতারণ ও অন্যান্য ছাত্র সেখানে গিয়া বুক দিয়া সে কাজ তুলিয়া দিতেছিল। ভবতারণ পরিশ্রমে সুপটু ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাকে কেহ কখনও কাজ করিতে দেখে নাই, আজ বেদান্তবাগীশের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কিন্তু সেরূপ নির্লিপ্তভাবের কোনও চিহ্ন তাহার ব্যবহারে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। অত্যন্ত আগ্রহ ও দক্ষতা সহকারে সকল কার্য্যে তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অনেকেই একটু বিস্ময় প্রকাশও করিয়াছিল। তবে বিষয়টির গুরুত্বের হিসাবে বেশীক্ষণ বিস্ময়-প্রকাশের অবকাশ এ সকল ক্ষেত্রে থাকে না, তাই সঙ্গে সঙ্গেই এ সম্বন্ধের আলোচনাও থামিয়া গিয়াছিল।

সারাদিন গুরুতর পরিশ্রমের পর কার্য্যগুলি যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সম্পাদিত হইল, তখন ভবতারণ পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া হাত-পা ধুইয়া উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ফেলিয়া নদীতীর অভিমুখে চলিয়া গেল। সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত। নিত্যকার্য্যে তাহার ঔদাসীন্য ছিল না।

নদীতীরে গিয়া সে তৃণাচ্ছন্ন একটি নির্জ্জন স্থানে বসিল। পরপারের গাছপালার অন্তরালে দিনের রবি ডুবিয়া গিয়াছিল, শুধু মেঘের কোলে তাহার কনক-দীপ্তির শেষ রেখা দেখা যাইতেছিল। ভবতারণ নদীর জল মাথায় দিয়া স্তব্ধভাবে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল। তার পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া নিমীলিত-নেত্রে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইল।

ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশে ফুটিয়া উঠিল। গগনপ্রান্তে অষ্টমীর ক্ষীণ শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিল। তরল অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণকুমার অবশেষে উঠিয়া ধীরপদে আবার গৃহাভিমুখে ফিরিল।

বেদান্তবাগীশ প্রিয়তম শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা ভবতারণ, আজ তোমরা বড় পরিশ্রম করিয়াছ, সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয়ন কর। কা'ল আবার বিশেষ পরিশ্রমের দিন।"

ভবতারণ মৃদুস্বরে বলিল, "আমি ত আজ অন্নাহার করিব না। কা'ল আমার পিতার বাৎসরিক। আজ সংযম করিয়া আছি।"

"কা'ল বাৎসরিক? তবে ত বাবা, তোমার বড় কষ্ট হবে?"

"আজ্ঞা, দুই একদিনের উপবাসে আমার কোনও কষ্ট হয় না, তা ত আপনি জানেন।"

"তা দেখেছি বৈ কি। তবে কি না, পরিশ্রমটা গুরুতর! আচ্ছা, তুমি তবে সকাল সকাল কিছু ফল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন খাইয়া শয়ন কর। আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

বেদান্তবাগীশ ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

(৬)

গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। রাত্রি দশটায় আর একটা লগ্ন ছিল বটে, কিন্তু গোধূলি-লগ্নটাই সে দিন প্রশস্ত বলিয়া ঐ লগ্নেই বেদান্তবাগীশ কন্যাসম্প্রদান করিবেন, স্থির হইয়াছিল।

বেলা থাকিতেই বরযাত্রিসহ পাত্রপক্ষ বেদান্তবাগীশের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বিস্তৃত অঙ্গনে চন্দ্রাতপতলে বিবাহসভা। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বহু মূল্যবান্ দান-সামগ্রী ও বরশয্যা আসরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলে। বরযাত্রীরা সকলেই দান-সামগ্রীর প্রশংসা করিতেছিল। একমাত্র কন্যার বিবাহে তিনি ত বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

সভা আলো করিয়া বর বসিয়াছিল। সকলেই ভবানীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিল। লগ্নের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া বেদান্তবাগীশ অগ্রে বিবাহের আয়োজন করিলেন।

বরপক্ষের অনুমতি-গ্রহণের পর বর আসিয়া আসনে উপবেশন করিল। বেদান্তবাগীশ স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন। একমাত্র কন্যার বিবাহ, হিন্দু রীতিনীতি ও শাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহারের কোনও ত্রুটী যাহাতে না হয়, সে দিকে তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য।

বরকে সম্বোধন করিয়া বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "বাবা, সন্ধ্যা-আহ্নিকটা সারিয়া লও।"

বর তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। আজন্ম কলিকাতাতেই সে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত। সকালে ও বৈকালে সে চা পান করে। পাঁউরুটীর টোষ্ট অথবা নিষিদ্ধ ডিম্ব-সিদ্ধ যে দিন চায়ের সঙ্গে না থাকে, সে দিন চা-পানের অর্দ্ধেক আনন্দ চলিয়া যায়,এমনই তাহার অবস্থা। বাল্যকালে উপনয়নের সময় গায়ত্রীটি সে শিখিয়াছিল। তার পর বড় হইয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের ও সকল হাঙ্গামা বড় একটা পোহাইতে হয় নাই। সন্ধ্যা করিলেও প্রশংসা কেহ করিত না, না করিলেও তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টাও কেহ কখনও করে নাই। পিতাকেও জন্মাবচ্ছিন্নে কোনও দিন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে যে দেখে নাই, তাহার পক্ষে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক একটা উদ্ভট জিনিস ছাড়া আর কি প্রতিপন্ন হইতে পারে?

বেদান্তবাগীশ অন্যান্য বিষয়ের সন্ধান লইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া

আজকাল সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার মত সন্দেহ ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

বর দেখিল, বড় গোলযোগ ; সে ব্যাপারটাকে জ্যামিতির প্রতিপাদ্য সমস্যার মত দুই একটি রেখা টানিয়াই সমাধানের চেষ্টা করিল। বিংশশতাব্দীর ভবিষ্যৎ যাহাদের হস্তে ন্যস্ত, বিবাহরূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানে দুই একটি কথা একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা তাহাদের কাছে দূষণীয় বলিয়া মনে হইল না। বর অম্লানবদনে বলিল, "সন্ধ্যাক্রিয়া পূর্ব্বেই শেষ করিয়াছি।"

বেদান্তবাগীশের হৃদয়ে কথাটা একটু প্রচণ্ডভাবেই আঘাত করিল। তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সভাস্থলে হাজির আছেন। তাঁহার জামাতার প্রতি তিনি এ যাবৎ স্নেহদৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন। কখন্ সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল? কৈ সেরূপ কোন লক্ষণ ত সে এযাবৎ প্রকাশ করে নাই।

অপ্রসন্ন ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়াছ? আচ্ছা তবে এইবার আচমন কর।"

সর্ব্বনাশ! সন্ধ্যা-আহ্নিক তবু যাহা হউক করিয়া দেখান যায়, কিন্তু আচমন? হাঁ, সে আচমনের নাম জানে বটে, মাঝে মাঝে পুরোহিত ঠাকুরকে পূজার সময় আচমন করিতেও দেখিয়াছে ; কিন্তু দেখিলেই কি তাহা পরিপাটীরূপে স্বয়ং করা যায়? যাহা হউক, বি, এ পড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান, কোথা হইতে জল লইয়া মুখবিবরে খানিকটা গ্রহণ করিল। ব্যাপারটা এমনই হাস্যোদ্দীপকভাবে সে করিয়া ফেলিল যে, বেদান্তবাগীশের সর্ব্ব-দেহ শিহরিয়া উঠিল।

একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণা, ব্রাহ্মণের আদর্শে প্রতিপালিতা ভবানীকে এই অব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলে কি সে সুখী হইবে? এমন ব্যাপারে সে ত কোনও দিন অভ্যস্ত নহে। শিক্ষা ও দীক্ষায় যাহাকে তিনি আচারপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-কুমারীর আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন, আজ তাহাকে কেমন করিয়া এই, আচারজ্ঞানহীন, ক্রিয়া-কর্ম্মবর্জ্জিত, শুধু উপবীতধারী যুবকের হস্তে সমর্পণ করিবেন? পদে পদে কি দুই ভিন্ন আদর্শে গঠিত নর-নারীর জীবনযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না? উভয়ের সংস্কার প্রতিদিন সামান্য খুঁটিনাটি অবলম্বন করিয়া উভয়ের মধ্যে পরিণামে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে, তাহাতে ত উভয়েরই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। পিতা হইয়া তিনি কিরূপে জানিয়া শুনিয়া কন্যাকে আজীবন অশান্তির অনলে নিক্ষেপ করিবেন? না—তাহা অসম্ভব।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এইরূপ চিন্তাপ্রবাহ বেদান্তবাগীশের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিল।

বেদান্তবাগীশ সেই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। দৃঢ়, অকম্পিত, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এ পাত্রে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব না।"

সহসা সভাস্থলের সমস্ত কলরব থামিয়া গেল। নিমন্ত্রিতগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। বরপক্ষীয়গণ ব্যাপারটা সহজে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

বেদান্তবাগীশের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল না কি? বরপক্ষের পুরোহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে তারানাথ বলিলেন, "এই অব্রাহ্মণের হস্তে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব না। পাত্রকে উঠিয়া যাইতে বলুন।"

বর পাংশুবদনে একবার বেদান্তবাগীশের পানে চাহিল। তার পর সে কাতরভাবে বরযাত্রীদিগের পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

বেদান্তবাগীশের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। এ যে জাতি যাইবার ব্যাপার। বিচক্ষণ বেদান্তবাগীশেরও শেষে মতিভ্রম ঘটিল? সকলে তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

বেদান্তবাগীশ তখন কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া ধীর-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কন্যার সুখের কামনা করিয়া আমি ক্রিয়াকর্ম্মহীন এই অব্রাহ্মণের হস্তে ব্রাহ্মণকুমারীকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই জন্যই আজ আমার এই প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, অথচ সন্ধ্যা-আহ্নিক এবং আচমন পর্য্যন্ত জানে না, আবার সে জন্য অনায়াসে মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিত নহে, এমন পাত্রে আমি কখনই কন্যা সম্প্রদান করিব না।"

সমস্ত সভা স্তব্ধ হইল। দুই এক জন প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্তু তর্জ্জনী তুলিয়া বেদান্তবাগীশ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। সভাস্থ আত্মীয়-স্বজন বেদান্তবাগীশের আচরণ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। সকলেই জানিতেন, এই সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে, এমন ব্যক্তি কেহ নাই। বিংশশতাব্দীর ভীষণ কন্যাদায়ের যুগে বেদান্তবাগীশ স্বেচ্ছায় এমন পাত্র ত্যাগ করিতেছেন, ইহা অনেক আত্মীয়ের নিকট নিতান্তই পাগ্‌লামী বলিয়া মনে হইল। এখনই আর সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং অদ্য রাত্রির মধ্যে বিবাহ না হইলে জাতি যাইবার সম্ভাবনা।

আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সে ব্যাকুলতা ও উদ্বেগের ক্রিয়া অন্তঃপুরেও সংক্রামিত হইয়াছিল। অন্তঃপুর হইতে পুনঃ পুনঃ বেদান্তবাগীশের তলব আসিল; কিন্তু দৃঢ়সংকল্প ব্রাহ্মণ পদমাত্র সঞ্চালন না করিয়া তেমনই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া

রহিলেন। শুধু বলিলেন, "কন্যাসম্প্রদানের পর আমি ভিতরে যাইব। তাহার আগে নহে।"

সবিস্ময়ে সকলে চাহিয়া রহিল। বর ততক্ষণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বরের পিতা অপমানে, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই সভায় তখনও তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

তারানাথ ডাকিলেন, "ভবতারণ!"

কোমরে কাপড় জড়াইয়া অন্যান্য ছাত্রের সহিত ভবতারণ বিস্মিতভাবে গুরুর কার্য্য দেখিতেছিল। তাহারা তখন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

গুরুদেবের আহ্বান শুনিয়াই সে দ্রুতপদে তদবস্থায় সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বেদান্তবাগীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ তুমি তোমার পিতার বাৎসরিক করিয়াছ না?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"অন্নাহার করিয়াছ?"

"আজ্ঞা না। পিতার বাৎসরিকের দিন আমি কখনও অন্নাহার করি না।"

"উত্তম। তুমি আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবে?"

আচার্য্যের মুখমণ্ডল একবার সে চাহিয়া দেখিল। উহা পূর্ব্ববৎ গম্ভীর; কিন্তু ঈষৎ উদ্বেগের লক্ষণ নয়নে প্রতিফলিত।

"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

ব্রাহ্মণ আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তুমি দরিদ্র; কিন্তু আমার যাহা কিছু আছে, সব তোমাদের। তুমি সুব্রাহ্মণ। তোমাকে সেবা করিয়া আমার কন্যা কখনও অসুখী হইবে না। সারাজীবন সে যেরূপ জীবনযাত্রার প্রণালীতে অভ্যস্থ, তোমার কাছে সে সেই ধারা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাইবে। বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আইস। আমি তোমাকে আমার ভবানী সম্প্রদান করিব।"

বিবাহসভা সহসা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে একটা উত্তেজনা-জনিত গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল; টোলের ছাত্রগণ সহসা আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল।

বরকে লইয়া তাহার পিতা তখন সভাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। দুই চারিটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য বরযাত্রী ব্যাপারটার শেষ দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্র লোক বরযাত্রীদিগের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেদান্তবাগীশের সম্মুখীন হইলেন। তিনি কোনও কলেজের অধ্যাপক। বিনা

আড়ম্বরে বেদান্তবাগীশের পদধূলি লইয়া তিনি বলিলেন, "আজ একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আমিও ব্রাহ্মণসন্তান, তবে ব্রাহ্মণের আচার-নিয়ম পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আপনার দৃষ্টান্তে আজ আমার দৃষ্টি ফুটিয়াছে। আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল।"

বৃদ্ধ রামগতি তর্কালঙ্কার সভাস্থলে উঠিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, "তারানাথ, আজ তুমি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করিতেছি। তোমার অবস্থায় আমরা কেহই এমন দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিতাম না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা-জামাতা সুখী হউক্।"

*   *   *   *

শুভদৃষ্টির সময় দ্বিগুণ রবে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বেনারসী ওড়নার অন্তরাল হইতে দুইটি লাজনত নয়নের দৃষ্টি যখন বরের প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন গোলাপী গণ্ডস্থলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল কি না, তাহা মানব-মনোবৃত্তির চিত্রকরগণই বলিতে পারেন।

বেদান্তবাগীশের আগ্রহাতিশয়ে বরযাত্রীরা আনন্দ-কোলাহল সহকারে সেই রাত্রিতে সেইখানেই পান-ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর 'আম্রবনে'র মধ্য দিয়া বাঙ্গলায় ইংরেজ আগমন করিয়াছে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর ভোর হইতে না হইতেই বাঙ্গলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। সহসা এ প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক, বুঝিবা ইংরেজ আসাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি ইংরেজ না আসিত, যদি পোর্টুগীজ আসিত, যদি ফরাসী আসিত, যদি মারাঠীরা জয়ী হইত, আলিবর্দ্দীকে পরাজয় করিয়া, বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যা কাড়িয়া লইত, তবে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয় হইত না? কে জানে,—কে বলিতে পারে?

ইংরেজ আসিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ক্ষাত্রশক্তি বিধ্বস্ত, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে পর্য্যুদস্ত একটা বিজিত জাতি সহসা বিজয়ী জাতির অনুকরণে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। না হউক ইহাই একমাত্র কারণ,—তথাপি ইহাই মূল কারণ। প্রশ্ন উঠিবে,—১৯শ শতাব্দীতে, ইংরেজ না আসিলেও কি বাঙ্গালী বসিয়া থাকিত? এ যুগে কি কোন জাতির পক্ষে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একেলা বসিয়া থাকা সম্ভব? আর যে সকল শতাব্দীতে ইংরেজের আগমন হয় নাই, সেই সকল শতাব্দীর ইতিহাসে কি বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের কথা নাই? এ দুই কথাই সত্য। কিন্তু ইহার উপরেও আমাদের কথা এই, ইংরেজ না আসিলে, বাঙ্গালী হয় ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা সংস্কার আন্দোলন করিত, কিন্তু সে আন্দোলনে হয় ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্ম-সমাজ হইত না। এমন কি, ইংরেজ যদি ১৮শ শতাব্দীতে আমাদের রাজা হইয়া না বসিত, 'বণিকের মানদণ্ড' যদি সহসা 'রাজ-দণ্ডরূপে' দেখা না দিত, ইংরেজ যদি এ দেশে শুধু বণিক্‌ভাবেই বসবাস করিত, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজরূপে প্রকট হইত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়ে শুধু ইংরেজ-জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ-আদর্শ প্রেরণা যোগায় নাই। ইংরেজ যে আমাদিগকে জয় করিয়াছে, আমাদিগকে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করিতেছে, ইহার মধ্যে ইংরেজের যে পরাক্রম প্রকাশ পাইতেছে, যে গৌরব ফুটিয়া বাহির হইতেছে, পরাধীন পতিত পতঙ্গ-জাতি অতি সহজেই সেই গৌরবচ্ছটার দিকে কতকটা অতর্কিতভাবে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীতে ইংরেজ

বাঙ্গালীকে জয় না করিলে, বাঙ্গালী ১৯শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ করিত না এবং সম্ভবতঃ এত দ্রুত ব্রাহ্ম-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় আবার একটা প্রতিক্রিয়া-মূলক যুগের সূত্রপাত দেখা যাইত না।

মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিতে হইবে? বিধবাদের বিবাহ দিতে হইবে? বিবাহে জাতি ভেদ ভাঙ্গিতে হইবে? এ সমস্তই ত পুরাণো মনিব মুসলমানের-দেখাদেখি করা যাইত। ইস্লামের মূর্ত্তি-বিদ্বেষ, ইস্লামের সামাজিক সাম্যনীতি, ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর খৃষ্টান ইংরেজ দাবী করিতে পারেন না। তবে বাঙ্গালী হিন্দু, বাঙ্গালী মুসলমানের দেখা-দেখি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ করিল না কেন? ইস্লামের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যে কেবল সঙ্কোচ-নীতিই অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নয়; বাঙ্গালী যে তাহার সম্প্রসারণ-শক্তিকেও ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রয়োগ করিয়াছিল, বাঙ্গালীর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস সে কথা নিশ্চয়ই বলিবে। তথাপি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়ের জন্য একটা নূতন বিজয়ী শক্তির সংঘর্ষণের নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইংরেজ এই নূতন বিজয়ী-শক্তি। তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সমাজেরই মত একটা আশু সংস্কারের প্রতীক্ষায় ছিল। শ্লাঘার বিষয়, বাঙ্গালী রামমোহন, এই বিজিত জাতির মধ্যে জন্মিয়াও বিজয়ী রাজার জাতিকে তাহার ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টান ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অথবা উৎকর্ষ, যাহা ইসলামধর্ম্মে প্রচুর-পরিমাণে ছিল, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও সমাজকে সম্ভব করে নাই। ইংরেজের রাজশক্তির প্রভাব ও মহিমা, আর বিচ্ছিন্ন শিথিল, পরাজিত বাঙ্গালী জাতির আত্মশক্তির সম্যক্ অপচয় ও অভাব হইতেই, ইংরেজের আগমনের ফলে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ দেখা দিয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গলায়, রাজশক্তিকে অবলম্বন করিয়া, সাধারণভাবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা, ও বিশেষভাবে যে খৃষ্টান-ধর্ম্ম, বাঙ্গালী সমাজের বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; যে সংঘর্ষণ, যে নিষ্পেষণ, যে মন্থন চলিয়াছিল, তাহারই ফলে একহস্তে অমৃত আর এক হস্তে বিষ-ভাণ্ড লইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ উত্থিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ইঁহারা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিশেষভাবে খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়ের কারণ, এবং ১৮২৮ খৃঃ হইতে মাত্র ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইহার অন্ততঃ তিন রকম আকার ও প্রকারের হেতু অতি অল্প আয়াসে এবং অতি স্পষ্টভাবে সকলেরই লক্ষ্য-গোচর হইতে পারে। রাজা রামমোহন, ১৭৭০ খৃঃ হইতে বাঙ্গলায় ইংরেজের অধিকার হইয়াছে, এইরূপ গণনা করিয়াছেন। রাজার বিবেচনায় প্রথম ৩০ বৎসর ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু ১৮০১ খৃঃ হইতেই "ইংরেজ—যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মোছলমানকে

ব্যক্তিরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকার করিতে-ছেন।" বলা বাহুল্য যে, ১৮২১ খৃঃ হইতে ১৮৩০ খৃঃ এ বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ১০ বৎসর অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে রাজা রামমোহন, বাঙ্গালী যাহাতে খৃষ্টান না হয়, তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিজয়ী রাজ-শক্তির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়াই, খৃষ্টান-ধর্ম্ম বিজিত বাঙ্গালীর চক্ষুকে বিদ্যুতের আলোকের মত ঝল সাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। সেই বিদ্যুৎ রশ্মির ক্ষণপ্রভা হইতে, রামমোহনের প্রবল স্বাজাত্যাভিমান ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বহুপরিমাণে রক্ষা করিয়া গিয়াছে। অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় "ইংরেজের বণিকভাব" বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বণিক অতি সাবধান পুরুষ। তিনি আপনার লাভের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্ক হইয়া চলিয়া থাকেন। * * * ইংরেজ বণিক্‌বেশেই ভারত লাভ করিয়াছেন।" কিন্তু ইংরাজের এই বণিক্‌ভাব রাজদণ্ড পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। এমন যে বাঙ্গালী আমরা, আমরাও তাহা সময় সময় অনুভব না করিয়া পারি নাই। রাজা রামমোহন তাহা বিশেষ করিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে রাজা বলিয়াছেন—"বাঙ্গলা দেশে যেখানে ইংরাজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরাজের নামে মাত্র লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয়?" মুহ্যমান জাতির দৌর্ব্বল্য, দৈন্য ও ভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, এই উন্নতশির সিংহগ্রীব ব্রাহ্মণ সে দিন যে পৌরুষ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার তুলনা কোথায়? "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে।" কেবল এক রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিস্তারের উপরেই সভ্যতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে না। রাজা ইতিহাস আলোড়ন করিয়া তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিলেন। 'সত্য ও ধর্ম্ম' যে ঐশ্বর্য্যের গহ্বরে কীটের মত বাস করে না, ইহাও ব্রাহ্মণোচিত তেজের সহিত ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালীকে খৃষ্টান হইতে দিব না, রামমোহনের ধর্ম্ম-সংস্কারের ইহাও একটা দিক্‌, এবং খুব বড় দিক্‌। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এ ক্ষেত্রে যে চেষ্টা, তাহার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর নিকট ১৮৫৯ খৃঃ এক চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এত দিন পরে মেদিনীপুর আক্রমণ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে। ঘর্ষণ দ্বারা সত্য জ্যোতিই বিকীর্ণ হইবে। খৃষ্টান-ধর্ম্ম যদিও ধনবলে ও রাজ্যবলে ও বিদ্যা-বলে অধুনা বলবান্‌, তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যবলে তাহারা সকলেই পরাজিত হইবেক। *** বিপক্ষদিগের (মিসনারীদিগের) দ্বেষানলের উত্তাপ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির পরিমাণ

নিরূপণ হইতে পারে।" এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময়ে মহাত্মা ডফ্ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্ম-সমাজ দেশে একটা শক্তি এবং খুব বড় রকমের শক্তি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা বড় দিক্ হইতেছে বাঙ্গালীকে খৃষ্টান হইতে না দেওয়া। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের একটি কারণ। এমন কি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে যে খৃষ্ট ভক্তি দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্ট-বিভীষিকা পর্য্যন্ত দেখিলেন,—সেই কেশবচন্দ্রের মধ্যেও প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের সুর বিশেষজ্ঞমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্ম-জীবনের উত্তরোত্তর অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মবিবাহ-বিধির সময় যদিও তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি;" তথাপি উত্তরকালে তিনিই বলিয়াছেন, "জাতিতে আমরা চিরদিন হিন্দু থাকিব। ** ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুবিরোধী-জাতিচ্যুত, বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু।" খৃষ্টান-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইহা গেল ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা আত্মরক্ষার দিক্। এই আত্ম-রক্ষার চেষ্টা হইতেই আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি, সে কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।

তবে খৃষ্টান-ধর্ম্ম বা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণের দিক্ কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্মে কি তাহা নাই? তবে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মকে সেকেলে হিন্দু আজিও সমান বিষচক্ষে দেখেন কি জন্য? ইহারও কারণ আছে। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। আর সেকেলে হিন্দু নিতান্তই নির্ব্বোধ, এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত হয় না।

রাজা রামমোহন পাদ্রীদের সহিত খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি বিচার করিবার সময় অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে জাতি সভ্যতার অন্যান্য বিষয়ে, বিশেষতঃ জড়-বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে ও শিল্পকর্ম্মাদি বিষয়ে এতদূর অগ্রসর, তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে এত অধিক অবনত কেন? এ দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনকালে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহাতে রাজা "Mathem tics, Natnaral philosophy, chem stry, Anatomy এবং অন্যান্য useful sciences" দুই হাতে বরণ করিয়া লইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত অপরা (?) বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াই পাশ্চাত্য জাতি সকল পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা জীবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি রাজার এইখানে এবং এই কারণের জন্য একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল, এবং বিশেষ-ভাবে খৃষ্টান-ধর্ম্মের নীতিবাদের প্রতিও রাজার সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্মের সাম্যবাদ-মূলক নীতিবাদকে তিনি অবিকল গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইউরোপ-বাসীদের সহিত আমাদের মেলামেশা যতই বেশী হইবে, সাহিত্যে, সমাজে ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা ততই উন্নত হইব, রাজার এইরূপ বিশ্বাসও ছিল। রাজার ব্রাহ্মধর্ম্মে,

পাশ্চাত্য সভ্যতার অপরা বিদ্যা ও খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ বিশেষভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে Eclecticism বলিতে চাও, বল, কিন্তু ইহা ঘটনা এবং ইহা ঘটিয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মেও, পাশ্চাত্য দর্শন ও খৃষ্টান সাধুদিগের উক্তি সোৎসাহে ও সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার চিঠিপত্র, যাহা অতি সামান্যই প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাতেই দেখা যায় যে,পরকাল বিষয়ে তিনি Kant, Fichte, Paul, Newman প্রভৃতির নিকট কত ঋণী। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে Hamiltonএর দর্শনশাস্ত্র তাঁহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আত্মায় পরমাত্মার রূপদর্শনে Cousinর অভিমত দ্বারা তিনি কিরূপে পরিচালিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে Descartes দর্শনের প্রতি তিনি এত অধিক নির্বিচারে নির্ভর করিয়াছিলেন যে, আমি তাহার অতি কঠোর সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তত্ত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সে সমস্ত স্তোত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া আমার পরলোকগত বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, উহার অনেকগুলিই স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের রচিত। আমি পুনরায় বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, ইহা হওয়া সম্ভব। কেননা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাহাতে তন্ময় হইবার যে সংকল্প ও সাধনা দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্ম-জীবনের বিশেষত্ব. তাহা এই সমস্ত রচনার অনেকগুলিতেই সুপরিস্ফুট। ১৮৬৮ খৃঃর মাঘোৎসবে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ একটি স্তোত্র পাঠ করেন। ঐ বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে উহা প্রকাশিত হয়। স্তোত্রটি ফরাসী খৃষ্টান-সাধু ফেনেলোঁর একটি প্রার্থনা হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজনারায়ণ বাবু অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ফেনেলোঁর বাঙ্গলা তর্জ্জমার ভিতরে উপনি-ষদের কয়েকটি শ্লোক প্রবেশ না করাইয়া মাঘোৎসবের সভায় ইহা পাঠ করেন নাই। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, "আত্মপ্রত্যয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্তম চাবি" হওয়া সত্ত্বেও, এবং কেবল উপনিষদ হইতে শ্লোক বাছাই করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে" সন্নিবিষ্ট হইলেও,—যথাবিধি খৃষ্টানধর্ম্মের বহিরাক্রমণ হইতে Vaidantic Doctrines Vindicated লেখান হইলেও এবং সবার উপর "খৃষ্ট বিভীষিকা" সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দর্শন ও খৃষ্টান সাধু ভক্তদের প্রার্থনা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মেও স্থান পাইয়াছে। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টান-ধর্ম্মকে গ্রহণের দিক্‌টা সমধিক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে এই গ্রহণের দিক্‌টা তেমন উজ্জ্বল নয়,—বরং অস্পষ্ট; সুতরাং ইহা অনেকের চক্ষুকে এড়াইয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ দেখিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে—তাহা রামমোহনেরই হউক, দেবেন্দ্রনাথেরই হউক, আর কেশবচন্দ্রেরই হউক, বিশেষভাবে খৃষ্টানধর্ম্ম আর সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জ্জন ও গ্রহণ—এই দুইটি ভাবই আছে। এই দুইটি শক্তিই যুগপৎ কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা বা খৃষ্টান-ধর্ম্ম হইতে কি গ্রহণ করিতে হইবে এবং

তাহার কিই বা বর্জ্জন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র একমত নহেন। অক্ষকুমারের সম্প্রদায় বা দল নাই;—নতুবা এই গ্রহণ-বর্জ্জন-ব্যাপারে তাঁহারও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, সে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবও কম নহে।

মোটের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত দিতেছেন যে, বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টান ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কোন কোন দিকে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোন কোন দিকে ইহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। হুবহু ইহাকে গ্রহণও করা যাইবে না, আর একেবারে ইহাকে অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

পাশ্চাত্যকে গ্রহণ ও বর্জ্জন কেবল আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না। পাশ্চাত্য আমাদিগকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা অসম্ভব। হয় ইহাকে গ্রহণ, না হয় বর্জ্জন, না হয় কতক গ্রহণ ও কতক বর্জ্জন— একটা কিছু করিতেই হইবে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যুষেই আমরা এই ভীষণ সমস্যা দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে, ইহাকে কতক গ্রহণ করিতে হইবে এবং কতক বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহনের ব্রহ্মসভাই একমাত্র আন্দোলন নহে। রাধাকান্তের ধর্ম্মসভা, ডিরোজীওর স্বাধীন চিন্তাবাদীর দল, শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়—ইঁহারাও এক একটা তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়া জাতির সমস্ত ইংরেজী-শিক্ষিত অংশটাকে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজ-দেহের সমস্ত অঙ্গ সমান অনুভূতিসম্পন্ন নহে;— আর বিকাশের পথে বৈচিত্র্যও কিছু অস্বাভাবিক নহে। কাজেই পাশ্চাত্যের সংঘাতে কম্পমান বহুবিধ তরঙ্গ প্রথম হইতেই জাতীয় চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। কত তরঙ্গ উঠিতেছে, কত তরঙ্গ পড়িতেছে, কিন্তু ইহারা কি বদ্ধ জলাশয়ে ঘূর্ণাবর্ত্তে তরঙ্গিত হইতেছে? ইহা কি স্রোত নহে? যদি ইহা স্রোত হয়, তবে সেই স্রোতের বেগ যাহাই হউক, তরঙ্গ যেমনই হউক, গতি কোন্ দিকে, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে হইবে।

রাধাকান্তের ধর্ম্মসভা স্রোতের মুখে বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের ফেনা বা বুদ্বুদ। ডিরোজীও-শিষ্যদের সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে স্বাধীন চিন্তা নাই, কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ না হউক, উদাসীনতা প্রায় অল্পাধিক সমগ্র ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কার্য্য ফুরায় নাই, তাঁহারা শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া অশিক্ষিত হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্য বিরাট্ বিশাল ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত জাতি সকলের মধ্যে গিয়া কেঁন্দ্র করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির ভিত্তি এইরূপে পাদ্রীগণ উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া দিতেছেন। অবশ্য, দোষ তাঁহাদের নয়, দায়ী আমরাই। এ দিকে আমরা

পাশ্চাত্যের আক্রমণ হইতে কখনও বা গোজাতি,কখনও বা ব্রাহ্মণজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সভা করিতেছি। অনেক স্থলেই বেহারী জমিদারকে ভাড়া করিয়া। বিচিত্র বহুবিধ তরঙ্গের বহুবিধ ভঙ্গিমা। কিন্তু আলোচ্য আমাদের ব্রাহ্ম তরঙ্গ, বিবেচ্য আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের সিদ্ধান্ত।

পাশ্চাত্যের কিছু বর্জ্জন এবং কিছু গ্রহণ করা যায় কি প্রকারে? পাশ্চাত্যের ভাল লইব, মন্দ লইব না? তাহা কি সম্ভব? তাহা কি পারা যায়? ব্রাহ্মসমাজ কি তাহা পারিয়াছেন? একটা জাতির ভাল ও মন্দ কি বিচ্ছিন্নভাবে সেই জাতির মধ্যে অবস্থান করে? একটা জাতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি তাহার ভাল ও মন্দ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়াইয়া থাকে না? কোন জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করা, সম্ভব হইলে, সহজ। কিন্তু কোন জাতির মন্দকে ভাল হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অন্য জাতির ভাল বা মন্দের সহিত সেলাই করিয়া দেওয়া শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। এই জন্য ব্রাহ্ম-প্রধানেরা যেরূপই সমাধান করুন না কেন, ব্রাহ্ম-সাধারণেরা পাশ্চাত্যকে বহু অংশে অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। দরিদ্র পরাজিত জাতি, ভাগ্যবান্ স্বাধীন বিজয়ী জাতিকে যদি তাহার সমকক্ষ না হইয়া কোন কোন বিষয়ে নকল করিতে যায়, তবে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরে কেবল নয়, ভিতরেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আবার তাহার সম্মুখে উন্নতির পথে অনন্ত সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু তথাপি এই অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যেও যাহা যে জাতির ভাণ্ডে নাই, তাহা সেই জাতির সম্মুখস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে থাকিলেও, তাহার কিছু আসিবে যাইবে না। একটা জাতির কতিপয় ব্যক্তি ইংরেজীতে চিন্তা করিতে পারেন, ইংরেজীতে স্বপ্নও দেখিতে পারেন, কথাবার্ত্তায়, আহারে-বিহারে, চালচলনে, হাবভাব ও ভঙ্গিমায় ইংরেজ সাজিতে পারেন, কিন্তু চিরকাল ধরিয়া একটা জাতি যাত্রা বা থিয়েটার করিতে পারে না। একদিন তাহার স্বভাব ধর্ম্মে তাহাকে ফিরি-তেই হয়, এবং এই স্বভাবধর্ম্মকেই বিচিত্র বিকাশের পথে চালাইতে হয়। সুতরাং বৈচিত্র্য বা উন্নতির বীজ এই স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে থাকা চাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ একটা বৈচিত্র্য। কিন্তু ইহার বীজ কি বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মে ছিল, না আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরেই ব্রাহ্ম-সমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে ও করিবে। ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে আর একটা ভ্রান্ত ধারণা অদ্যাপি আছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, কোন কোন ব্রাহ্মকেই তাহার প্রতিবাদ করিতে দেখা গিয়াছে। ইঁহারা পাশ্চাত্যকে বলেন 'বিশ্ব।' এই বিশ্বের সহায়তায় আমাদের 'জাতীয়-বিশেষকে' অশেষ উন্নতির পথে ইঁহারা অগ্রসর করাইতে পারিবেন, এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু রাজা রামমোহনের মধ্যে যদি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সহিত খৃষ্টান নীতিবাদ গ্রহণ করায় একটা eclecticism আসিয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহার প্রতিবাদ হইবে, এবং স্বামী

বিবেকানন্দের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহার সুত্রপাতও আমরা দেখিয়াছি, যদিও স্বামী বিবেকানন্দও এইরূপ eclecticismএর হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন, তথাপি রামমোহনের একটা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ মনের মধ্যে ছিল, তাহা যে উপায়েই তিনি লাভ করিয়া থাকুন না কেন। ধর্ম্মের সেই সার্ব্বভৌমিক আদর্শকেই তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিনটি বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, এই সমস্ত ধর্ম্মগুলিকে নবযুগের উপযোগী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বা সভ্যতার সেই সার্ব্বভৌমিক আদর্শ, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সভ্যতার মধ্যেই বর্ত্তমান। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক আদর্শমাত্রই প্রকাশে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ধর্ম্ম বা সভ্যতার কোনরূপ প্রকাশই সার্ব্বভৌমিকতার দাবী করিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বা খৃষ্টানধর্ম্ম একটা বিশেষ সভ্যতা ও বিশেষ ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর সভ্যতা বা বাঙ্গালীর ধর্ম্মও একটা বিশেষ সভ্যতা ও বিশেষ ধর্ম্ম। অবশ্য, দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা পরস্পর মুখোমুখী হইলে যে তাহারা পরস্পরকে দেখিয়া ও বুঝিয়া উপকৃত না হয়,তাহা নহে। কিন্তু অবস্থা, কাল, ও পাত্রবিবেচনা করিতে হইবে। নতুবা ইহা বিপজ্জনকও বটে। কে জানে, পাশ্চাত্য এমনি করিয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়ায়, আমরা আমাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটা মহাবিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছি কি না? অসমান অবস্থায় পতিত হওয়াতে আমরা কি পাশ্চাত্যকে স্বাধীনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে পারিতেছি? যদি তাহা না পারিয়া থাকি, যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাহা না পারিয়া থাকেন, তবে বাধ্য হইয়া পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতিকে যে অনুকরণের স্পর্দ্ধা করিয়াছে, তাহা অনেকাংশে স্বাভাবিক হইলেও লজ্জারই পরিচায়ক—গৌরবের নহে। এ কথা বলিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে যে,পাশ্চাত্য আমাদের বিশ্ব। আর এ কথা বলিলেও আমাদের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে যে, অনন্যোপায় হইয়া আমরা বিজয়ী জাতিকে অনুকরণ করিতে গিয়াছিলাম, এবং তাহারই ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজ জাতির ইচ্ছাপ্রসূত তত নহে, যত অবস্থাধীনে, বিগত রাষ্ট্র-বৈভবের দিনে, ঘটিয়া পড়িয়াছে। ঘটিয়া পড়ে অনেক জিনিস। কিন্তু তাহার সমস্তই কি বাঞ্ছনীয়, না সমস্তই গৌরবের?

এই ব্রাহ্ম-সমাজের আর একটি বিশেষত্ব, কলঙ্কপূর্ণ এবং আত্মঘাতীবিশেষত্ব যে, এই ধর্ম্মের সাম্যবাদ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায় ব্যতিরেকে, আর বেশী দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই, পারিল না। এমন যে রাজা রামমোহন, তিনিও তন্ত্রের ধর্ম্ম, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ বলিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলার বৈশ্যবণিকজাতির বহুতর শাখা-প্রশাখার এবং বিশালতর হিন্দু শ্রমজীবী সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখিয়াছেন। কোন একটা বড় ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্যকরূপে নিরূপণ করা মানব-জ্ঞানের সাধ্যাতীত। তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিন আমাদের

বঙ্গভূমির বক্ষে যে স্রোত বহাইয়াছিল, যে বন্যা ছুটাইয়াছিল, যে সমাজ-বিপ্লব, যে রাষ্ট্র-বিপ্লবের হস্ত হইতে বাঙ্গলাকে অন্ততঃ তিনটি দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিল, ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া রাজা রামমোহনের প্রতিভাও তাহা সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা বড় দুঃখের কথা। যে বাঙ্গলায় একদিন মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছিল, সে বাঙ্গলাও স্বাধীন ছিল না, মুসলমানর অধীন ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব-বেদান্তে যে তত্ত্বের আভাষ বাঙ্গালী পাইল, বৈষ্ণব প্রেম-ধর্ম্মে যে ভাবের স্বাধীনতা বাঙ্গালীকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইল, যে স্বাধীনতার আবেগে বাঙ্গালী বাঙ্গলার বেড়া ডিঙ্গাইয়া সমগ্র ভূভারতকে ধর্ম্মে স্বাধীন করিবার জন্য ছুটিল, পৃথিবী আজিও সে ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস শুনে নাই। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, অমানীকে মান দিয়া, হরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে বাঙ্গালীর এই প্রেম-ধর্ম্ম সম্রাটের তরবারির সম্মুখে মাতালের কলসীর কানার আঘাতে দরবিগলিত-রক্তাক্ত-দেহে, সত্যাগ্রহের ধর্ম্মাগ্রহের যে প্রচণ্ড বিক্রম দেখাইয়াছিল, আজ তাহা বাঙ্গলায় রূপকথার কাহিনী হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে এত বড় ধর্ম্ম-বিপ্লব ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখাইতে পারে না। সেই বিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল বাঙ্গলা হইতে, বাঙ্গালীর তীর্থ নবদ্বীপ হইতে; সে দিন বাঙ্গালী কাশী জয় করিয়াছিল, সে দিন বাঙ্গালী দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিল, সে দিন বাঙ্গালী, উৎকলে গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত বা উন্মত্ত আমরা, শিক্ষিত আমরা, রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কিংবা কায়স্থ আমরা, বাঙ্গালীর সেই দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেও পারি, না করিলেও পারি। কেন না, কোন ইংরেজ সিভিলিয়ান অথবা জজ তাহার ইতিহাস লেখেন নাই।

বাঙ্গালীর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে ভাবে ছড়াইয়া পড়িল, আচণ্ডালে প্রেমের আলিঙ্গন প্রসারিত করিল, রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যে এক ভাবের স্বাধীনতা আনিল, এক বৃহৎ প্রাণশক্তিকে সমগ্র সমাজ-শরীরে সঞ্চার করিয়া দিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা পারিল না। কিন্তু কেন পারিল না? পারিল না, কেননা, রাজা রামমোহন প্রথম হইতেই স্থির করিলেন যে, ইহা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের ধর্ম্ম। পারিল না, কেননা, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি বেকনেরও নাম শুনে নাই, আর ফেনেলোঁর স্তোত্রও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পারিল না, কেননা, যাহারা দশের নয়, দেশের নয়, যাঁহারা রাজা, জমিদার, যাঁহারা ধনের আভিজাত্যে, জাতির আভিজাত্যে আজীবন মণ্ডিত রহিলেন, তাঁহারাই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পারিল না, কেননা, বাঙ্গালী উপনিষদের যুগে ফিরিয়া যাইতে পারে না। পারিল না, কেননা, বাঙ্গালী তাহার ধর্ম্মের ও সমাজের বৈশিষ্ট্য হারাইতে প্রস্তুত নয়। আর পারিল না,—কেননা, ব্রাহ্মসমাজের মতি ও গতি অস্থির, চঞ্চল আজ আছে, কাল নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ কোন একটা বৃহৎ ভাবকে

বাঙ্গালী ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া, অনুভূতির আবেগে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গলার সুরে ও রূপে তাহাকে ভরপুর করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে তুলিয়া দেখাইতে পারে নাই। রাজা-জমিদারে এ দেশে আর যত উপদ্রবই করুক, ধর্ম্ম-প্রচার করে নাই। বাঙ্গালী শাক্তের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, স্মৃতির ব্যবস্থা মান্য করিয়াছে, নব্য ন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, বৈষ্ণবের হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছে, কেননা, ইহার প্রত্যেকটিরই বীজ বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মে নিহিত ছিল, এবং তাই ছিল বলিয়াই তাহার এমন আশ্চর্য্য বিকাশও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিকাশের বীজ বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মে ছিল কি না, সন্দেহ। যদি থাকিত, তবে তাহার বিকাশ হইল না কেন ?

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক নেতৃব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গলার সহিত ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দেশের একটা সাদৃশ্য আছে। ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল। বাঙ্গলায় ১৯শ শতাব্দী বা এমন কি, বিংশ শতাব্দীতেও তাহা সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। কেননা, যাহাদের লইয়া রাষ্ট্রের শক্তি, সেই মূলধন ও ব্যবসাপরিচালনকারী জাতি সমূহ—যাহারা আধুনিক ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ হইতে বিদ্যা-বুদ্ধি ও চরিত্রবলে কোন দিকেই ন্যূন নহে, তাহারা উক্ত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের নিকট জল-অনাচরণীয়। বিরাট্ শ্রমজীবী সম্প্রদায়—কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র প্রভৃতি ইহারা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের নিকট অস্পৃশ্য। পরিশ্রম এবং মূলধন যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন,—সংখ্যায় যাঁহারা কেহ লক্ষ, কেহ কোটী, তাহাদিগকে জল অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য রাখিয়া ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ আশা করেন যে, তাহারা 'ডিমোক্রেসির' দোহাই দিয়া রাজনৈতিক শাঠ্যে ও চতুরতায় যে জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, সামরিক বলে ও কৌশলে যে জাতি জগজ্জয়ী, সেই ইংরেজজাতির নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবেন, এবং লাভ করিয়া কি করিবেন ? না, ব্যবসা, মূলধন ও পরিশ্রম যাহাদের আছে,—তাহাদের হাতের ছোঁয়া জল পান করিবেন না। এরূপ উৎকট আকাঙ্ক্ষা আর বিকট সাধনা কেবল উন্মাদেই সম্ভব।

বাঙ্গলার এই ব্যবসা, মূলধন ও পরিশ্রম কোন ক্রমেই বাক্‌সর্ব্বস্ব চাকুরী-জীবী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের সহিত মিলিত হইবে না। কেননা, তাহা হইলে তাহাদের আত্ম মর্য্যাদা ও স্ব স্ব জাতির মর্য্যাদার লাঘব হইবে। উদ্বুদ্ধ এই জল-অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতি-সমূহ আজ ইংরেজের দ্বারস্থ। কেননা, রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহাদের স্বার্থের ক্ষতি। তাহারা যদি কোন দিন ক্ষিপ্তই হয়, তবে তাহারা ক্ষিপ্ত হইবে,—জল-আচরণীয় ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের বিরুদ্ধে। তাহার ফলে আর যাহাই হউক, বাঙ্গলায় ইংরেজ-শাসনকে দৃঢ়তর করিবে। কাজেই ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দেশের সহিত যাঁহারা ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গলার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়কে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মত একটা সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লব বলিয়া

গৌরব করেন, তাঁহারা দুই ও ভিন্ন অসমান প্রকৃতির বস্তুকে একত্রে তুলনা করিয়া, দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভুলিয়া কেবল ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিকে অপমান করেন মাত্র।

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের পার্থক্যই ফরাসী ও ব্রাহ্ম-বিপ্লবের একমাত্র পার্থক্য নহে। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব—আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব। আর ব্রাহ্ম-বিপ্লব—আভিজাত্যের পক্ষ হইতে এমন একটা বিপ্লব, যাহার সহিত বাঙ্গলার 'গণ-বিগ্রহ'কে ধারণ করিয়া আছে—যে সকল জাতি, তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সুসমাচার এই একশত বৎসরের মধ্যেও এমন বহুস্থানে বহু-সম্প্রদায়ে, বহু স্তরে পৌছায়ই নাই,—আজিও পৌছায় নাই, যাহাদের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে সমগ্র জাতির জাতীয় ভাবের উত্থানের কোনই আশা নাই। কাজেই পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া যে জাতীয় উত্থান প্রয়োজনবোধে ব্রাহ্ম-সমাজ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আভিজাত্য-সম্প্রদায়েই আবদ্ধ রহিয়াছে,আভিজাত্যের বাহিরে কোন ছিদ্র দিয়াও তাহার রশ্মি গিয়া পৌছে নাই। সুতরাং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রয়োজন যদি কল্পিত হয়, বাঙ্গালী জাতির জাতীয় উত্থানের দিক্ দিয়া, তবে নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ সে প্রয়োজনসাধন করিতে সম্যক্ অপারগ হইয়াছেন, এবং কতিপয় সত্যবাদী ব্রাহ্ম যে তজ্জন্য 'মনস্তাপবিশিষ্ট', তাহাও আমরা জানি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আভিজাত্যের ধর্ম্ম। এ যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণ-তন্ত্রের যুগে আভিজাত্যের ধর্ম্ম কখনও যুগধর্ম্ম হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যুগধর্ম্ম হইতে পারে নাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ,ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সম্প্রদায়ের দশবিশ জনকে খৃষ্টান হইবার আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু এত বড় একটা যুগধর্ম্ম, তথাকথিত নিম্ন-জাতি সকলকে দলে দলে খৃষ্টান হওয়ার বিরুদ্ধে একটি বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র করিতে পারিল না। ইহা দ্বারা এই নবধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা অত্যন্ত জঘন্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

"নর-নারী-সাধারণের সমান অধিকার।
যাহার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতি-বিচার।"

বৈষ্ণবের দেশে ইহা কিছুমাত্র নূতন কথা নয়। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরি-ভক্তিপরায়ণঃ"; কিন্তু কথায় কি আসে যায়? যাঁহারা এই কথা কহিলেন, তাঁহারাই সেই কথা পালন করিলেন না। বাক্-চাতুরী, বাক্-মহিমা, বাক্-বিভূতি ১৯শ শতাব্দীতে ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য আনিয়াছে। কিন্তু চাঞ্চল্য গতি নয়, চাঞ্চল্য মুক্তি নয়। বাঙ্গালীর গতি-মুক্তি ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় করিতে অপারগ হইয়াছেন। বিভিন্ন জাতির স্তরে স্তরে যে ব্যবচ্ছেদ আছে, যাহার জন্য কোন প্রকার 'সত্যিকার জাতীয় একতা একেবারে অসম্ভব, যাহা রাজা রামমোহন বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন,

দেবেন্দ্রনাথ সেই গুরুতর সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের দিক্ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজকে, রাজনারায়ণ বসুর পরামর্শে, বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার মহৎ অপকারসাধন করিয়াছিলেন কি না, কে বলিবে ?

১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে প্রয়োজন ছিল, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় সমাজক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনই ছিল, অর্থাৎ জাতির নিষ্ফল আভিজাত্য যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জাতির চিত্তকেই স্পর্শ করিতে পারেন নাই। কি ভাবে যে এ দেশে জাতীয় আন্দোলন করিতে হইবে, এই প্রবল অথচ জগদ্দল দেশাচারের নিষ্পেষণ হইতে জাতির অন্তরাত্মাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়াও উঠিতে পারেন নাই—অবলম্বনও করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্র ও যুক্তির দোহাই দিয়াছেন, বেদ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, আবার বেদকে পরিত্যাগও করিয়াছেন, দেশাচারকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, রাজ-শক্তির আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন, বিলাতগমন করিয়াছেন—কিন্তু কি ফল হইয়াছে? বৈষ্ণববেদান্তকে উপেক্ষা করিলেও রামমোহন তন্ত্রের সাধনাকে কতকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কিংবা শাক্ত কোন দিক্ দিয়াই কোন পথ পান নাই।

বাঙ্গালী জাতির সভ্যতার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আছে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-গণ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই সম্ভবতঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথবা কে জানে, কে বলিতে পারে, তাঁহারা কেন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই ?

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে—বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য

বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে। কিন্তু তাহা কেহ লেখে নাই। বাঙ্গালীও একটা জাতির মত জাতিই ছিল, কিন্তু সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দী নহে। বাঙ্গলার প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন নহে। বাঙ্গালীর ধর্ম্মান্দোলন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন নহে। খৃষ্টান ইউরোপের প্রোটেষ্টাণ্ট Protestant ধর্ম্মান্দোলনের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলনকে এবং Prot stant আন্দোলনের কারণগুলির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলনের কারণগুলির তুলনা করিয়া, যাঁহারা বিচার করেন এবং এই উভয় আন্দোলনের মধ্যে কায়ক্লেশে একটা সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া যাঁহারা মনে মনে একটা অনির্ব্বচনীয় গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা ইংরেজের স্কুলের ছাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালী নহেন।

প্রত্যেক বিশেষ জাতির ইতিহাস তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লেখা উচিত। সকল জাতির ইতিহাস একই বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত হইতে পারে না। কেননা, সকল জাতির বৈশিষ্ট্য একই বস্তুর উপর নির্ভর করে না। ইংরেজের ইতিহাস যে উপাদানে রচিত, বাঙ্গালীর ইতিহাস সে উপাদানে রচিত হইতে পারে না। অথচ দু এক-খানা খ্যাতনামা বাঙ্গলার ইতিহাসও এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত হইয়া অনেক মহামূল্য নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদানকে ব্যর্থ করিয়াছে মাত্র।

বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গালার ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই, ক্রম-বিকাশের পথে তাহাদের পারম্পর্য্য নাই, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিচার নাই, আছে প্রাচীন দুচারিটি মুদ্রার সন তারিখ লইয়া শুষ্ক বাদানুবাদ। ইহারও সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহা বাঙ্গলার ইতিহাস নহে।

ব্রাহ্ম আন্দোলন যদি বাঙ্গালীর হয়, তবে ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া, ইহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসের আগেকার ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের সহিত তুলমূল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি প্রাচীন আন্দোলনগুলির সহিত ইহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ না থাকে, যদি বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার পারম্পর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, ইহার বীজ যদি বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মে না থাকে, তবে বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার দাবী কিসের? বাঙ্গালীর অনেক শতাব্দীরই ইতিহাস নাই। ১৯শ শতাব্দীরও না হয় নাই থাকিল?

কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গলার ইতিহাস এবং তাহাতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দেখিতে হইবে, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কি, এবং তাহার ইতিহাস কোথায়? আর দেখিতে হইবে, সেই বৈশিষ্ট্যের সহিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের কোন যোগ আছে কি না?

শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমালোচনা-সাহিত্যে একটা পাহাড়-পর্ব্বত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন,—

—"কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্র-শাস্ত্র-জননী বঙ্গমাতা কত কাল আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অবশ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না,—কত দিন থাকিবেন। কিন্তু ভূদেব-ব্রাহ্মণের এই উক্তির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রকে বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি; এবং ইহার সহিত বাঙ্গালীর স্মৃতিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেও সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি। বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গালীর সাহিত্য ছাড়িয়া দিয়াও, (যদিও তাহা ছাড়িয়া দিবার বস্তু নহে) এই চারিটি বাঙ্গলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

যে স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু-জাতি আপনাদের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবন, এবং এক অত্যাশ্চর্য্য সমাজবিন্যাস রচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহাকে স্বীয় প্রতিভা ও অবস্থানুযায়ী অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত ও অনেক স্থলে সংশোধিত

করিয়া লইয়াছে। রঘুনন্দন তাহার শেষ সাক্ষী। বাঙ্গালী জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাও গ্রহণ করে নাই, গৌতমের ন্যায়কেও ডাকিয়া আনে নাই। তাহার স্মৃতির অনুযায়ী দর্শন সে নিজেই উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। নব্যন্যায়ে বাঙ্গালীই গুরু, সমগ্র হিন্দু ভারতবর্ষ তাঁহার শিষ্য। এই ন্যায়ে ঈশ্বরবাদ আছে, গৃহীর সকাম কর্ম্ম আছে, সংসার যাঁহার মিথ্যা জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার জন্য নিবৃত্তিমার্গ ও মোক্ষের অবসরও আছে। অথচ এই নব্যন্যায় ও দায়ভাগ স্মৃতিতন্ত্রে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যও আছে। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বাঙ্গালী, মুসলমানের অধীনে থাকিয়াও, ধর্ম্মে ও সমাজে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।" কি আশ্চর্য্য উপায়ে যে বাঙ্গালী ১ হাজার বৎসর আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আর কি আশ্চর্য্য রকমে আজ আমরা তাহা ভুলিয়া গেলাম।

পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে বাঙ্গালী এইরূপে স্থিতি ও গতির অবসর রাখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে জগতে একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখিয়াছে। কে এই প্রতিভার পরিমাণ করিবে? কে ইহার ইতিহাস লিখিবে?

তার পর বাঙ্গলায় শাক্ত আছে, বাঙ্গলায় বৈষ্ণব আছে। ইহারও ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে, দর্শন আছে, সাধন-পদ্ধতি আছে, সম্প্রদায় আছে, দেবদেবী আছে। ইহারাও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর কোন সভ্যজাতি এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য গৌরব অনুভব করিবে না?

বাঙ্গালী বৌদ্ধ হইয়াছিল, জৈন মতও বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য মতবাদ পরবর্ত্তী কালের শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে কি পলি রাখিয়া গেল, কে আলোচনা করিয়াছে? কেন কাশ্মীরের তন্ত্রে আর বাঙ্গালীর তন্ত্রে পার্থক্য? কেন বৈদিক ধর্ম্মে দেবপূজা আর বাঙ্গলার তান্ত্রিক ধর্ম্মে দেবীপূজা? কেন উত্তর-ভারতে শিব, আর বাঙ্গলায় কালী? কেন বৈদিক প্রণালীতে যাগযজ্ঞ, কেন তান্ত্রিক প্রণালীতে জপ ও সাধন-মাহাত্ম্য? কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবে আর দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবে পার্থক্য। কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবে এত মধুরভাব, যুগলভাবের প্রাবল্য; আর কেনই বা বাঙ্গালীর তন্ত্রে মাতৃভাবের প্রাধান্য। তাই ত ভাবি, বাঙ্গলায় এত বৈশিষ্ট্য, এত স্বাতন্ত্র্য, এত বৈচিত্র্য, এত গৌরব আর অথচ এত লজ্জা!

ব্রাহ্ম আন্দোলন এই ইতিহাসে, এই বৈচিত্র্যে কি স্বত্বে সংযুক্ত হইতে চাহেন? এই ইতিহাসের ধারায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কার্য্য-কারণ-সম্পর্কে সংবদ্ধ? এই তত্ত্ব যিনি উদ্ঘাটন করিয়া না দেখাইতে পারিবেন, এবং না দেখাইতে পারিয়াছেন, ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিষয় বিবৃত করিতে যাইয়া তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ করিবার কোন অধিকার নাই।

আমরা দেখিতে পাই, রাজা রামমোহনের ধর্ম্ম-সংস্কারে বাঙ্গালীর দর্শন, স্মৃতি এবং

বিশিষ্ট সাধন-সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালীর দর্শন, স্মৃতি এবং সেই সঙ্গে শাক্ত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ১৮শ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছিল। ইহার সকলকেই রাজা রামমোহন এক অখণ্ড ঐক্যমূলক ভিত্তির উপর আহরণ করিয়া আনিবার চেষ্টায় ছিলেন। এই জন্ত তাঁহাকে শাঙ্কর বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে তিনি রঘুনন্দনের 'পরে স্মৃতিকে কোন কোন দিকে সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব, সাধনে ও মতে পরস্পর-বিরোধী হইয়া যখন বিনষ্ট হইতেছিল, তখন তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের ভূমিতে তাঁহাদের উভয়কেই তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের বিরোধভঞ্জনের চেষ্টায় ছিলেন। এইরূপে অনেকাংশে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি বিধিমত রক্ষাই করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন-পন্থীর এই প্রকার সমালোচনার প্রশংসা আমরা করি, কিন্তু ইহাকে সমস্ত দিক্ হইতে স্বীকার করিতে পারি না।

রামমোহনে নব্য-ন্যায়ের আলোচনা কোথায়? পৈতৃক সম্পত্তির উপর পিতার অধিকার-বিশ্লেষণে কে বলিবে, তিনি দায়ভাগের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না, অবশ্য, স্ত্রীজাতির স্বত্বাধিকার-নির্ণয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ব্যবহারিক জগতের স্বত্বাদির সহিত তাঁহার মায়াবাদ ও নির্গুণ-ব্রহ্মের সামঞ্জস্য কে খুঁজিয়া দিবে? বৈষ্ণব-বেদান্ত বলিয়া যে একটা বেদান্ত ছিল, "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" বলিয়া যে বাঙ্গালীর একটা দার্শনিক মতবাদ ছিল, শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে উপনিষদের অনুরূপ না হইলেও, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এবং ইহার সিদ্ধান্তগুলি যে বহুস্থলেই অনেক শ্রুতির অনুরূপ এবং ইহার দার্শনিক ভিত্তিও যে বেদান্তের একটি শাখার সহিত অনুস্যূত, তাহা তিনি বিবেচনা করিলেন কোথায়? জীব ও বলদেব বিদ্যাভূষণকে শঙ্করে আনিয়া ঘুলাইয়া দেওয়া কি বাঙ্গালীর বেদান্তকে, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া? অবশ্য, তন্ত্রের ঝোঁক অনেকটা শাঙ্কর অদ্বৈতের দিকে। সে জন্যই হউক অথবা আর যে জন্যই হউক, বাঙ্গালীর তন্ত্রের অদ্বৈতের দিক্‌টা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্ত্রের যে 'মাতৃভাবে'র বৈশিষ্ট্য, তাহা রামমোহনে কোথায়? না হয়, বৈষ্ণবের 'কান্তভাব' অশ্লীল বলিয়া তিনি পরিত্যাগ করিলেন! না হয়, নিতাই-গৌর "দুই ভাই" তাঁহার অত্যন্ত চক্ষুঃশূলই হইয়াছিল?

রামমোহন যাহা হউক,—দেবেন্দ্রনাথে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কোন একটাও কোন একদিক্ হইতে নূতন বল লাভ করে নাই, কোন নূতন শক্তি লাভ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। বেদ বলিতে দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনেরই মত, বেদের 'অন্ত' বুঝিলেন, 'আদি' বুঝিলেন না। বেদ কিন্তু শুধু বেদান্ত নহে। বেদ শুধু জ্ঞানকাণ্ড নয়, কর্ম্মকাণ্ডও বটে। বেদের এই কর্ম্মকাণ্ডের দিক্‌টা কি রামমোহন, কি দেবেন্দ্রনাথ একেবারেই উপেক্ষা করিলেন। তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করিলেন না, সংস্কার-সংশোধন ত

দূরের কথা। সমগ্র রাঙ্গালী হিন্দু তন্ত্রের দীক্ষা ও উপাসনা দ্বারা পরিচালিত। এই তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রতিধ্বনি ইহাতে শুনা যায়। বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান তান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্ত্রের মধ্য দিয়াই বৈদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দেবেন্দ্রনাথ বেদের আদি মানিলেন না; বেদের অন্তও অক্ষয়কুমারের প্ররোচনায় পরিত্যাগ করিলেন। বেদের স্থানে তিনি আনিলেন তাঁহার "আত্ম-প্রত্যয় ও সহজ-জ্ঞান।" যদিও ইহারও মূলে অনুকরণ, * তথাপি ইহা নিশ্চয়ই এক ভীষণ বিদ্রোহ। সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথ ভাবিতে পারেন নাই—ইহা কত বড় বিদ্রোহ।

উপনিষদের বাক্যগুলি আনকোরা আগন্তুকের মত বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনায় কোন দিনই স্থান পায় নাই। কেননা, বাঙ্গালীকে ইতিহাস গড়িয়া চলিতে হইয়াছে, বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উদ্ভাবন করিয়া চলিতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর বেদান্ত আছে। কিন্তু তাহা শঙ্করও নয়, রামানুজও নয়। তাহা শাক্ত-বেদান্ত, তাহা বৈষ্ণব-বেদান্ত। বেদান্তের প্রধানতঃ দুই শাখা, এই দুই শাখাই বাঙ্গলায় আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রতিভার সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ কি শাক্ত-বেদান্ত, কি বৈষ্ণব-বেদান্ত কিছুরই খোঁজ-তল্লাস করেন নাই। বেদান্তের বিশাল দুইটি ধারায় বাঙ্গালী যে তাহার প্রতিভার ছাপ দিতে সমর্থ হইয়াছিল, বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মের অনুযায়ী তাহাকে যে নববৈচিত্র্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ, কেবল দেবেন্দ্রনাথ কেন, কোন ব্রাহ্ম নেতাই বাঙ্গলার বেদান্তের সেই দুই শাখাকে এই একশত বৎসরে পল্লবিত বা মুকুলিত করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর বেদান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন—কার্ত্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্য লইয়া। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা চালাইতে চাহিয়াছেন—পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত অসংবদ্ধভাবে উপনিষদ-বাক্যকে মিশ্রিত করিয়া। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মচিন্তা ও সাধনপদ্ধতিকে, বাঙ্গালীর 'আচার' ও 'ব্যবহারকে' দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত করিতে পারেন নাই। রামমোহন-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদসূচক উপাসনাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া দেবেন্দ্রনাথ ফেনেলোঁর স্তোত্র দিয়া তাহাকে সরস ও সগুণ করিয়াছেন। অমৃতসরের গুরুদরবারের নিকট হইতেও তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কিছু কিছু

---

* "The rock of in tuition" ere long began to be spoken of; and every attack made in Europe on what was called "book-revelation" was eagerly repeated in India. In fact, it would be a serious mistake to hold that the changes we have been chronicli g were spontaneous movements of the Hindu mind; they seldom, or never were so."—Hinduism Past and Present p. 228—J. M. Mitchell, M. A, L. L. D.

আহরণ করিয়াছেন। সেই 'গগনমে থাল রবি-চন্দ্র-দীপক বনে,' আসিয়াছেন, পারস্য হইতে হাফেজ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন—হাফেজের গোলাপ, সাকী, সিরাজী সকলেই আসিয়াছেন। কিন্তু—সেই—

—"থির বিজরী, বরণ গোরী,—
চলে নীল শাড়ী, নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর—"

আসিতে পারেন নাই। আর আসিতে পারেন নাই, সেই—

—"গলিত চিকুরঘটা, নব জলধর-ছটা,
ঝাপল দশদিশি তিমিরে।"

কেননা, ইহারা যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর। ইহারা যে এই মাটীর সহিত রসে-রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালীর হৃদিশতদল হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বড় দুঃখেই বলিতে ইচ্ছা হয়—

—"মন হারালি কাজের গোড়া,
তুই কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।"

আর সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ব্যর্থ আহরণ পদ্ধতি (Eclecticism) দেখিয়া ইহাও বলিতে ইচ্ছা হয়—

—"মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও,
বিধির লিপি কপালযোড়া।"

দেবেন্দ্রনাথ শাক্ত-বেদান্ত ছাড়িলেন—কেননা, তাহা অদ্বৈতবাদ-ঘেঁসা। বৈষ্ণব-বেদান্ত ছাড়িলেন—কেননা, "চৈতন্য অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতার।" আর এই দুইকেই ছাড়িলেন, কেননা, ইহারা পৌত্তলিক। আরো ছাড়িলেন—কেননা, ইহাদের সম্বন্ধে, কি সাধনাঙ্গে, কি তত্ত্বাঙ্গে, তিনি কিছুই জানিতেন না।

এমনি করিয়া অজ্ঞতায় ও অধিকারের অভাবে যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা কি সত্যই আজ উপেক্ষণীয়? জাতির স্বভাবধর্ম্ম হইতে, স্বাভাবিক বিকাশ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও বিচ্ছিন্ন করিয়া যে পাঁচফুলের সাজি নির্ম্মাণ, তাহা কি বৈচিত্র্য,

তাহা কি বিকাশ, তাহা কি অভিব্যক্তি? ইহাকে কি বলিব। ইহা অনুকরণ, ইহা আত্ম-বিস্মরণ, ইহা অন্ধতিমিরাবগুণ্ঠনে পিচ্ছল পথে আত্মঘাতী অভিসার, ইহা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অতি জঘন্য ব্যভিচার।

অনেক বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ সন্দেহ করেন যে, রামমোহনে সম্যক্ সৌন্দর্য্যানুভূতি ছিল না। দেবেন্দ্রনাথে রসবোধ নাই, রূপোল্লাস নাই, সৌন্দর্য্যপিপাসা নাই, এ কথা কে বলিতে সাহস করিবে? দেবেন্দ্রনাথে যাহা কিছু আছে, তাহা ত ইহাই। এ যুগের এত বড় এক জন সৌন্দর্য্যের উপাসক, সমগ্র শতাব্দীতে যাহার প্রায় তুলনা নাই, তিনি কি করিয়া এমন পথভ্রষ্ট হইলেন? তাঁহার কণ্ঠে বাঙ্গলার সুর ফুটিল না; তাঁহার ধ্যানে বাঙ্গলার রূপ ধরা দিল না! দুর্ভাগ্য শুধু আমাদের নয়, তাঁহারও।

ঈশ্বরের পিতৃভাব দেবেন্দ্রনাথ প্রচার করিলেন, ও ঈশ্বরের সহিত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধকে 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রাণ' বলিয়া ঘোষণা করিলেন—খৃষ্টীয় দর্শন ও খৃষ্টীয় নীতিবাদ ও খৃষ্টীয় সাধু-মোহান্তদের বাণীর উপর কয়েকটা শ্রুতিবাক্যকে বসাইয়া দিলেন। আবার ব্যাখ্যা দিলেন—"আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানে"র ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বিপ্লবের ইতিহাসে ইহার স্থান আছে কি? থাকিলে, কোথায়?

যিনি বেদ ছাড়িলেন, শাক্ত ও বৈষ্ণব ছাড়িলেন, তিনি বাঙ্গালীর স্মৃতিকেও ছাড়িতে বাধ্য। অথচ দেবেন্দ্রনাথের একটা স্বাভাবিক রক্ষণশীল ভাব, যাহা বিশেষভাবে ধনের, মানের ও কুলের আভিজাত্য দ্বারা পরিপুষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে, হিন্দু-সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এক মূর্ত্তিপূজা ব্যতীত আর সকলই রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই মূর্ত্তি-পূজা পরিহার রামমোহনের দেখাদেখি দেবেন্দ্রনাথের একটা আত্মপ্রত্যয়মূলক বিদ্রোহ। স্মৃতি বা ন্যায়-শাস্ত্র, শাক্ত বা বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকে এ বিষয়ে তিনি কোন শাস্ত্রীয় বিচারে পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করেন নাই। কাজেই 'আচারের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্মৃতির সংস্কার নহে। আর অন্যান্য অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মদের মত তিনি যে জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা প্রভৃতি সমস্ত 'আচারের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এইখানেই তাঁহার প্রতিভার, তাঁহার আভি-জাত্যের, তাঁহার অনুপম শিল্পরসবোধেরও বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গলার একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী তাঁহার অন্তরের সত্য শিব ও সুন্দরকে বাহিরে প্রকাশিত করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ এই নির্দ্দোষ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে হঠকারিতাবশে একদিন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালীর স্মৃতির আশ্রয় হইতে, সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মহত্যার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আজ এক রাজদ্বারে ভিক্ষা ভিন্ন ব্রাহ্মদের কি উপায় আছে? সেকেলে হিন্দু কাজেই ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানে কোন পার্থক্য দেখিতে পান না এবং কোন পার্থক্য করেনও না।

স্মৃতির 'ব্যবহারের' দিক্ দিয়া দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন

নাই। অথচ তাঁহার প্রবর্তিত নূতন ধর্ম্ম হইতে একটা নূতন আচার ও ব্যবহারপদ্ধতি উদ্ভাবন করাও কিছু সুখের কথা নয়, বা একদিনের কাজ নয়। দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার সহিত, এই নূতন ব্রাহ্ম "অনুষ্ঠান-পদ্ধতি" উদ্ভাবন করিবার সময় একটা মর্মান্তিক স্ববিরোধিতা দৃষ্ট হয়। তিনি এ বিষয়ে তাঁহার নিজের বিপদ্ ও দুর্বলতা সম্ভবতঃ অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে" তিনি বলিয়াছেন—"যে ধর্ম্ম সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্য্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই।" যাহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই, ব্রাহ্ম-সমাজ দেবেন্দ্রনাথকে দিয়া তেমনি একটা দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু এক নূতন ধর্ম্ম নয়, ব্রাহ্ম-সমাজও এক নূতন সম্প্রদায়রূপে দেখা দিল। কালে ১৮৭২ খৃঃ ইহা হিন্দু-সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই রাজশক্তির আনুকূল্যে ১৮৭২ খৃঃ ব্রাহ্ম-সমাজকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার গৌরব বা কলঙ্কের ভাগী। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে হিন্দুসমাজভুক্ত রাখিয়াই ইহার উন্নতিবিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করার আপত্তি আছে।

রামমোহন যে নির্গুণ একেশ্বরবাদীদিগের জন্য ব্রহ্ম-সভা করিলেন, তাহাতে সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির লোকেরই প্রবেশ-অধিকার ছিল। ধর্ম্ম হিসাবে তাঁহারা সকলেই ত একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে পূর্ব্বের অনেকানেক নির্গুণ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় যেমন দশনামা সন্ন্যাসী, দাদূ, নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি দলের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই ব্রহ্ম-সভায় 'ভজনালয়ের' সভাদের মধ্যে স্বভাবতঃই ধর্ম্মের মতে ও সাধনে ঐক্য হইয়া একটা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইহা স্বাভাবিক। এই সম্প্রদায়ের একটা সামাজিক দিক্ অবশ্যই থাকিবে। কালে তাহার একটা প্রয়োজন অবশ্যই অনুভূত হইবে। হইয়াছিলও তাহাই। দেবেন্দ্রনাথ এই সমস্যা দ্বারা নিপীড়িত হইয়া প্রথমে দোলায়মান হইলেন, পরে রাজনারায়ণ বাবুর পরামর্শে এবং স্বীয় রক্ষণশীলতা ও আভিজাত্যরক্ষাকল্পে ইহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু তাহাই নয়,—এক সময় ইহার বিরুদ্ধাচরণও করিলেন। নতুবা কে বলিতে পারে, ১৮৭২ খৃঃ ইতিহাস কি আকার ধারণ করিত? সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া কেশবচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরাকার ব্রহ্মকে যাঁহারা একসঙ্গে উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্মৃতির আদেশ অমান্য করিয়া, হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া পরস্পরের মধ্যে সঙ্কর-বিবাহে আবদ্ধ হইলেন, আরও অনেকে ঐরূপ কার্য্যে দুঃসাহসিকতা দেখাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। হিন্দুসমাজ প্রতিবাদ করিল, দেবেন্দ্রনাথও যে উদ্দেশ্যেই হউক, প্রতিবাদ

করিলেন,—কেশবচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া রাজদ্বারে আশ্রয় লইলেন। ১৮৭২ খৃঃ ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি আইনে পরিণত হইল। ব্রাহ্মগণ এই আইনের প্রসাদে কবুল জবাব দিয়া, হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। অদ্যাবধি সেইরূপই চলিতেছে। রামমোহনের আরব্ধ কার্য্য অবস্থাধীনে কেশবচন্দ্রে একটা স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত হইল। যাহারা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একসঙ্গে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,—তাহারা কি কালে একসঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে না? রামমোহন ইহাতে বিশ্বাস করিতেন। আর দেবেন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ বলিয়াছেন। তবে তাঁহার আচরণ যদি কথার অনুরূপ না হইয়া থাকে, তিনি যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া মতপরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য কে দায়ী? যেমন বীজ, তাহ হইতে তেমনি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল। ইহা অবশ্যই এক বৈচিত্র্য। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেশে ইহা আর একটি সম্প্রদায়বিশেষ। কিন্তু ইহার বীজ বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মে ছিল কি না—আমাদের আশঙ্কা সেইখানে। তাই আমি আবার বলি, যদি থাকিত, তবে তাহার বিকাশ হইল না কেন? গৃহী শাক্ত ও বৈষ্ণব যেমন বাঙ্গলীর এক স্মৃতির অধীন, এক সমাজবিন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত, গৃহী ব্রাহ্ম তেমনি সেই বাঙ্গলার স্মৃতি, সেই বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের পর্য্যায়ভুক্ত থাকিতে পারিল না। এইখানেই অস্ত্রের রেখা, আর ব্যথাও এইখানেই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

গণিকাতন্ত্র সাহিত্য

গোড়ার কথা

আজকাল রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে (democracy) গণতন্ত্রের কথা খুবই শুনা যাইতেছে, গণতন্ত্রের প্রভাব সাহিত্যেও অনুভূত ও অনুস্যূত হইতেছে। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে গণতন্ত্রের কথা বলিতেছি না, গণিকাতন্ত্র-সাহিত্যের কথা বলিতেছি। আমাদের সাহিত্যে দিন দিন ইহার প্রসার বাড়িতেছে, নাটক-নভেলে, গল্পে-কবিতায়, এই শ্রেণীর নায়িকার কাহিনী বিবৃত হইতেছে, ইহা বোধ হয় পাঠক-সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়াছেন। শুধু সাধারণ-পাঠ্য সাধারণ মাসিকপত্রে কেন, ছাত্র-পাঠ্য ও ছাত্র-পরিচালিত কলেজ-ম্যাগাজিনে পর্য্যন্ত এই ধরণের গল্প প্রকাশিত হইতেছে। সুদূর-মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য ও ছাত্রলিখিত কলেজ-ম্যাগাজিনে এই কীর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কালমাহাত্ম্য বটে! ৪।৫ বৎসর হইল, নব প্রকাশিত 'নারায়ণে'র প্রায় প্রারম্ভ-সংখ্যায়ই এই ধরণের 'ডালিম' গল্প পড়িয়া গল্পের নায়ক, লেখক, পত্রের সম্পাদক, এমন কি, সাক্ষাৎ 'নারায়ণে'র উপর অভক্তি হইয়াছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। তাড়াতাড়ি রাগের ঝোঁকে গল্পটার একটা উপসংহারও লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। 'নারায়ণে' ক্রমশঃ 'মরণে জয়,' 'হাসির দাম,' 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা,' 'বিচারক' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, সবগুলিতেই এই শ্রেণীর নারীর কথা অল্পবিস্তর আছে। আবার সে দিনও 'জীবন-নাট্য' গল্পে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) এই শ্রেণীর চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখিলাম। উক্ত পত্রে ক্রমশঃ-প্রকাশিত 'কমলের দুঃখ' আখ্যায়িকায় হেনার চিত্রও এই শ্রেণীভুক্ত। আবার আর এক মজার ব্যাপার এই যে, সুবিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রে একজন সমালোচক 'শুভদৃষ্টি' নামক একখানি ছোট গল্পের পুস্তক সমালোচনা করিতে গিয়া উক্ত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'জয়মাল্য' গল্প সম্বন্ধে অসহিষ্ণুভাবে বলিয়াছিলেনঃ—'তার পর গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, বারনারীকে না টানিলে কি গল্পের রূপ বাড়ে না?' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৪)—আর উক্ত মাসিকপত্রে বৎসর ঘুরিতেই বারনারীকে টানিয়া নায়িকা সাজাইয়া একটি গল্প বাহির হইয়াছে! ('প্রত্যর্পণ' প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৫।) * প্রকৃতির

---

* প্রবন্ধের চতুর্থ অংশে গল্প দুইটির আলোচনা করিব।

প্রতিশোধ বটে! শেক্স্‌পীয়ারের ভাষায়—and thus the whirligig of Time brings in his revenges' !

বর্ত্তমান লেখকের মনেও প্রথমে এই শ্রেণীর চিত্রের উপর যে ঘোর বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা কতকটা কাটিয়া গিয়া প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কেন সমাজ-বহিষ্কৃতা, নিন্দিতচরিত্রা, ঘৃণ্যা, কলঙ্কিতা পতিতাদিগের কাহিনী সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে হয় ত গম্ভীরপ্রকৃতি সামাজিকগণ ইংরেজ কবির প্রসিদ্ধ বাক্য উদ্ধৃত করিবেন :—

Vice is a monster of so frightful mien,
As to be hated, needs but to be seen ;
Yet seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.'

এবং সুনীতি ও সুরুচির দোহাই দিয়া এই আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবেন। এই শ্রেণীর চিত্রের বাহুল্য সম্বন্ধে তাঁহারা হয় ত সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন যে, তথাকথিত সভ্যতার প্রসারে যেমন বেশ্যার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি এই শ্রেণীর নায়িকা-অবলম্বনে রচিত সাহিত্যেরও পুষ্টিপুষ্টি হইতেছে—উভয় কদর্য্য ব্যাপারই আধুনিক আসুর বা তামসিক সভ্যতার ফল।

কিন্তু আমার মনে হয়, সাহিত্যে যখন এরূপ একটা ব্যাপার (phenomenon) আবির্ভূত হইয়াছে, তখন ধীরভাবে ইহার নিদান-নির্ণয় করা সমালোচকের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কয় বৎসরে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠক-সমীপে তাহা উপস্থাপিত করিব। সিদ্ধান্তটি সুবিবেচিত কি না, তাহার বিচারের ভার সুধীমণ্ডলীর উপর। প্রধানতঃ 'নারায়ণে' প্রকাশিত কয়েকটি গল্প পড়িয়াই প্রথমে বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল এবং 'নারায়ণে'র উপরও অভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। তাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' 'নারায়ণে'র সমীপেই এই আলোচনার ফল নিবেদন করিলাম।

(১)

বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীর কাহিনী সবই এক ধরণের নহে। ফলতঃ এগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পাঠক-সমাজ ধৈর্য্য ধরিয়া এই চারি শ্রেণীর আলোচনা দৃষ্টিগোচর করিয়া তবে যেন বর্ত্তমান লেখকের বক্তব্য

সম্বন্ধে বিচার করেন, প্রথম দুই শ্রেণীর আলোচনার পরেই রায় প্রকাশ না করেন, লেখকের এই অনুরোধ।

প্রথম শ্রেণীটি একেবারেই আধুনিক নহে, ইহা অতি পুরাতন। যাঁহারা মথি-লিখিত সুসমাচার প্রভৃতির মারফত যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে মেরি ম্যাগড্যালেন * নামে এক পতিতা নারী খ্রীষ্টের প্রতি পরম ভক্তিমতী ছিলেন, খ্রীষ্টের দেবত্বের প্রভাবে তাঁহার সকল ময়লা দূর হইয়াছিল ও তিনি খাঁটি সোণায় পরিণত হইয়াছিলেন। 'কয়লাকো ময়লা ছোটে :যব আগ করে পরবেশ।' খ্রীষ্ট যে পতিতপাবন, অধমতারণ, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা ছিলেন। (আধুনিক সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক এই পতিতা নারীকে কেন্দ্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে খ্রীষ্টের পূতপ্রভাবে পতিতার হৃদয়ের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও প্রেমভক্তির উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।)

ইংরেজিনবিশ পাঠকের নিকট এই নারী সুপরিচিতা, তাই দৃষ্টান্তটি সর্ব্বাগ্রে দিলাম নতুবা আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মসাহিত্যে এই প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১শ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ে) ও মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৭৪ অধ্যায়ে) পিঙ্গলা বেশ্যার নির্ব্বেদের উপাখ্যান আছে। 'ভক্তমালে' বেশ্যার হরিভক্তির আখ্যান আছে (১৫শ মালা, চরিত শ্রীবারমুখী)

—'বৈষ্ণব দর্শনের যে কি তক মহিমা।
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেলা।'

উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত বেশ্যা চিন্তামণির হরিভক্তি-সঞ্চারের ইতিহাস (১২শ মালা, চরিত্র শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়) সুবিদিত। আধুনিক সাহিত্যে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের মারফত এই বৃত্তান্তটি সুপ্রচারিত হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুরকে ভ্রষ্টাচার করিতে গিয়া বেশ্যা উদ্ধার পাইয়াছিল, এ সংবাদও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রসাদে (অন্ত্য-লীলা ৩য় পরিচ্ছেদ) সকলে জানেন; পালি সাহিত্যেও না কি এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আছে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বেশ্যা বাসবদত্তার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠকের সুপরিচিত। মহাপুরুষের সংস্পর্শে, অথবা প্রকৃত হরিভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমের

---

* বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বাইবেলে (লুক-লিখিত সুসমাচার, ৭ম পরিচ্ছেদ ৩৬—৫০) যে Sinner পতিতার প্রসঙ্গ আছে, সে নারী মেরি ম্যাগড্যালেন নহে। কিন্তু সেই পতিতাই মেরি ম্যাগড্যালেন, জনসাধারণের হৃদয়ে এই পরম্পরাগত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। মেটারলিঙ্কও এই প্রচলিত বিশ্বাসের অনুযায়ী মেরির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

উদয় হইলে অধম বেশ্যারও উদ্ধার হয়, ইহাই প্রতিপাদন করা এই সকল উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মহাপুরুষ-মাহাত্ম্য বা হরিভক্তিমাহাত্ম্য খ্যাপন করা এগুলির উদ্দেশ্য। মহাপুরুষের পবিত্রতা, উদারতাতিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ পাপীয়সী কুলটাদিগের বিরোধিতায় (contrast) উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে। উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়া বেশ্যার প্রসঙ্গেও এই শ্রেণীর সাহিত্য-কলুষিত হয় না, সাহিত্যের, সুরুচির, সুনীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, বরঞ্চ সমাজের সমক্ষে উচ্চ পূত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিবেচনায়ই ধর্ম্মগ্রন্থ-লেখকগণ উপাখ্যানগুলিকে ধর্ম্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

যাহা হউক, এই শ্রেণীর চিত্র লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই, কেননা, ইহা আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্টতা নহে, প্রাচীন সাহিত্যেই ইহার প্রসার। কচিৎ আধুনিক কবিগণ এরূপ দুই একটি উপাখ্যানের আধুনিক সংস্করণ প্রচার (modernise) করিয়াছেন, যথা—মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এখনকার অবিশ্বাসের যুগে এ সব অলৌকিক ঘটনার কল্পনা বা ধারণা করা যেন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর চিত্রের বাহুল্য নাই, দু'একটি পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়ে, সেগুলি ডাক্তারী ভাষায় sporadic, অথবা চলতি ভাষায় stray cases!

(২)

কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বেশ্যাব আমদানি করা হইতেছে, বেশ্যার হাবভাব, ছলাকলা, চাতুরী, কপটতা, ভালবাসার ভান, নীচতা, অর্থলোভ, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-লালসা প্রভৃতির, এক কথায় বেশ্যার জঘন্য জীবন-যাত্রার বাস্তব চিত্র রং ফলাইয়া অঙ্কিত করা হইতেছে। সমালোচনা-শাস্ত্রের ওস্তাদগণ ইহার নাম দেন—realism in art অর্থাৎ কাব্যকলায় বস্তুতন্ত্রতা। ফরাসী সাহিত্যে Alphonse Daudetএর Sappho ও Zolaর Nana আগাগোড়া এই বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আখ্যায়িকাকার ফীল্ডিং ও স্মলেট কোনও কোনও আখ্যায়িকার ভিতর এই শ্রেণীর নারীর ইতিহাস গছাইয়া দিয়াছেন, ডিফো এই শ্রেণীর নারীকে নায়িকা করিয়া গোটা বইই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই সব আখ্যায়িকা উপলক্ষ করিয়া মার্কিণ সমালোচক বার্টন বলিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন (inn, public-house) পান্থশালা বা চটীতে শ্রান্ত পান্থ ও তাহার বাহনের জন্য খাদ্যপেয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত থাকিত, সাইনবোর্ডে লেখা থাকিত 'Entertainment for man and beast', তেমনি এ সব আখ্যায়িকায়ও

'Entertainment for man and beast' আছে অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি উভয়েরই আনন্দদানের ব্যবস্থা আছে!

খণ্ডচিত্র-হিসাবেও আধুনিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর বেশ্যার চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন কোন নাটকে (ওথেলোয় Biar ca, হেন্‌রি দি ফোর্থে Doll Tearsheet ইত্যাদি) এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে, ইহারই আদর্শে রচিত ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা'য়, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'গৃহলক্ষ্মী'তে, প্রাসঙ্গিকভাবে, আখ্যানের সম্পূর্ণতা-বিধানের জন্য, এই শ্রেণীর খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। 'নারায়ণে' ক্রমশঃ প্রকাশিত 'কমলের দুঃখ' আখ্যায়িকায় হেনার চিত্রও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'র দ্বিতীয় পর্ব্বে টগর বৈষ্ণবী ঠিক বহুচারিণী বেশ্যা না হইলেও তাহাদেরই মাস্‌তুতো ভগিনী, সুতরাং এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। টগর অল্প পরিসরের মধ্যে বেশ ফুটিয়াছে। পক্ষান্তরে, 'কমলের দুঃখে'র হেনার ডগ্‌ডগে রং অনেক পাঠক ও সমালোচককে দুঃখ দিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্রে নায়িকা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী বা গণিকা। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে দুই চারিটা উদ্ভট শ্লোক ভিন্ন আর কোন বাড়াবাড়ি ত দেখি না। এক দশকুমারচরিতে * অপহারবর্ম্মচরিতে কামমঞ্জরী কর্তৃক মরীচি মুনির যোগভ্রংশ পুরাণাদিতে বর্ণিত উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি কর্তৃক ঋষিগণের তপোভঙ্গের জের, প্রভেদের মধ্যে কামমঞ্জরী ও তাহার মাতা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, ইন্দ্রের উপকারের জন্য এই অপকার্য্যে অগ্রসর হয় নাই। এই পুস্তকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত (অপহারবর্ম্মচরিতে) রাগমঞ্জরীর ও (মিত্রগুপ্তচরিতে) চন্দ্রসেনার একনিষ্ঠতা এবং মৃচ্ছকটিকে ও ভাসের নবাবিষ্কৃত নাটকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত বেশ্যাকন্যা বসন্তসেনার একনিষ্ঠতা ইহাদিগকে এই শ্রেণীর অনেক উর্দ্ধে স্থান দেয়। ইহাদিগের কথা প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাসঙ্গিকভাবে আখ্যানের সম্পূর্ণতা-বিধানের জন্য অনেক সময় এইরূপ কুৎসিত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই হিসাবেই শেক্‌স্‌পীয়ার, মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটককারগণ এরূপ

---

* দশকুমারচরিতে (মিত্রগুপ্তচরিতে) ধূমিনীর কথা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কেননা, সে রূপজীবিনী নহে, ব্যভিচারিণী কুলস্ত্রী, গৃহস্থবধূ, বসন্তসেনার মত 'সলজ্জা গণিকা' নহে, 'নির্লজ্জা কুলস্ত্রী'।

খণ্ডচিত্র নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলি।

সমাজে যখন 'সু' 'কু' দুই-ই আছে, সাহিত্যেও দুইএরই চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, কেননা, সাহিত্য সমাজের ছায়া। কুৎসিত বাদ দিয়া শুধু সুন্দরের সমাবেশ করিলে, সে সাহিত্য সঙ্কীর্ণ, অসম্পূর্ণ, একপেশে, এমন কি, একঘেয়ে হইয়া পড়িবে। আলো ও আঁধার, পুণ্য ও পাপ, সুন্দর ও কুৎসিতের পাশাপাশি অবস্থানে, (contrast) বিরোধিতায় উভয় চিত্রই ফুটিয়া উঠে, সুন্দরের সৌন্দর্য্য কুৎসিতের কুৎসিতত্বের পাশেই বেশী খোলে, যেমন কালো গায়ে সোণা বেশী মানায়। আমাদের কবি বলিয়াছেন :—

'সন্দেহ, হইত কিনা রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত॥'

রামের পাশে রাবণ, সীতার পাশে শূর্পণখা, (কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, 'সুভ্রাতৃবৎসল' লক্ষ্মণের পাশে ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ!) যুধিষ্ঠিরের পাশে দুর্য্যোধন, বিদুরের পাশে শকুনি—এইরূপ বিরোধিতায় পুণ্যাত্মার পবিত্রতা ও পাপাত্মার অপবিত্রতা উভয়ই অধিকতর পরিস্ফুট হয়, সৎসাহিত্যের প্রকৃত নৈতিক উদ্দেশ্য—রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতবং ন রাবণাদিবৎ—সফল হয়, পুণ্যে প্রবৃত্তি এবং পাপে অপ্রবৃত্তি ও ঘৃণার উদ্রেক হয়।

আবার একই চরিত্রে পাপ ও পুণ্যের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চিত্রিত করিতে হইলে, কুপথ হইতে সুপথে প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস বিবৃত করিতে হইলে, আলোর পাশে আঁধারের স্থানও দিতে হইবে। বেশ্যা চিন্তামণির, বা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো' গল্পে বেশ্যা বিজলীর হৃদয়ে সুমতির সঞ্চার বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের পূর্ব্বাচরিত পাপ-জীবনের যবনিকা একটু উত্তোলন করিয়া না দেখাইলে, কিরূপে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করান যাইবে?

বস্তুতন্ত্রতার পক্ষপাতিগণ কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া মত প্রকাশ করেন যে,—জীবতত্ত্ববিৎ যেমন নিরীহ হিংস্র, সুঠাম কদাকার, ক্ষুদ্র বৃহৎ, উচ্চ নীচ ইত্যাদি বিভেদ ভুলিয়া সকল জীবেরই তত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্টচিত্ত, কোন জীবকেই তিনি ঘৃণার বা বিরাগের চক্ষে দেখেন না অথবা অবহেলার বস্তু মনে করেন না; শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ বিচার করেন না, শরীরের সকল অঙ্গ সম্বন্ধেই সমদর্শী, কোন অঙ্গকেই নিকৃষ্ট, কুৎসিত, জুগুপ্সাজনক, হুঙ্কারজনক, অশ্লীল মনে করেন না; চিকিৎসক যেমন কুৎসিত রোগের, বিকট ক্ষতব্রণ-বিস্ফোটকের,

নাম শুনিয়া, আকার-প্রকার দেখিয়া, কর্ণে অঙ্গুলি দেন না, চক্ষু মুদ্রিত করেন না, নাসিকা-কুঞ্চন করেন না, রোগ-নির্ণয় ও রোগ-প্রতীকার হইতে বিরত হয়েন না; সেইরূপ সাহিত্যস্রষ্টাও কুৎসিত বলিয়া কোনও বস্তু সাহিত্যজগৎ হইতে বাদ দিতে পারেন না, কেননা, সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ-শরীরতত্ত্ব, সামাজিক ব্যাধিনিরূপণ ও তৎ-প্রতীকার-চেষ্টা সাহিত্যের এলাকাভুক্ত। ইহার ভিতর ঘৃণার, বিরাগের, জুগুপ্সার স্থান নাই, নির্বিকার-চিত্তে নির্বিচারে নরনারীর চরিত্র-বিশ্লেষণ সাহিত্যস্রষ্টার প্রকৃত কার্য্য; সু কু, মহৎ বা নীচ বলিয়া পাত্র-পাত্রীর প্রতি পক্ষপাত থাকা প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উচিত নহে। (Realism) বস্তুতন্ত্রতাকে এই চক্ষে দেখিয়া ফরাসী সাহিত্যের ওস্তাদগণ—Flaubert, 'Stendhal' (H. Beyle) Balzac, Zola—(আমাদের সাহিত্যেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে) সাহিত্যক্ষেত্র হইতে কোনও বস্তুই বর্জ্জন করেন নাই, বরং দার্শনিকের সমদর্শিতা ও বৈজ্ঞানিকের একাগ্রতার সহিত, যে সকল চিত্র সাধারণতঃ সাহিত্যস্রষ্টারা সুনীতি ও সুরুচির খাতিরে অঙ্কিত করিতে চাহেন না, সেই সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, অতি নিপুণতার সহিত রং ফলাইয়াছেন, পাঠকের চিত্তপটে সেগুলি গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের ধুয়া—(Realism) বস্তুতন্ত্রতার উদ্দেশ্য ঘৃণা বা সমবেদনার, বিরাগ বা অনুরাগের উদ্রেক করা নহে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যথাযথ বর্ণনা, 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতঞ্চ লেখকে নাস্তি দোষকঃ।'

আবার যাঁহারা Art for Art's Sake মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, যেমন ভাবুকের চক্ষে বিশ্বসৃষ্টির সকল বস্তুই সুন্দর ও শোভন, কিছুই অপ্রয়োজনীয় বা অবহেলনীয় নহে, ভাবুকের চক্ষে, রসগ্রাহীর চক্ষে, সেইরূপ কবির সৃষ্টির সকল বস্তুও সুন্দর ও শোভন, কাব্যরাজ্যে সুরুচি বা সুনীতির কোন অধিকার নাই, একেবারেই নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। * রসসৃষ্টিই সে সব কাব্যের উদ্দেশ্য, এ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা বা 'শুচিবায়ু' প্রবেশ করিলে রসসৃষ্টির প্রয়াস পঙ্গু হইয়া পড়িবে। **Art is out of reach of morals, for her eyes are fixed upon anything of moral things beautiful and immortal and ever-changing. To morals belong the lower and less intellectual spheres.'—Oscar Wilde.**

ইহা ছাড়া আজকাল কাব্যনাটকের মারফত সমাজ-সংস্কারের, সমাজের অনাচার

---

* অসহিষ্ণু পাঠক হয়ত বলিবেন, তবে কি বটতলার পচাল মাল এই যুক্তিতে অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিতে হইবে? তাহার উত্তর, সে সব অনাসৃষ্টি খাঁটি আর্ট নহে, ঝুটা আর্ট।

অত্যাচার প্রদর্শনের ও সেই সকল অনাচার অত্যাচারের প্রতিবিধানের প্রয়াস হই-তেছে; সামাজিক-সমস্যা-অবলম্বনে কাব্যনাটক-রচনার প্রথা প্রচলিত হইতেছে (এগুলিকে problem play, problem novel বলে;)—এই সংস্কারকগণ বলিতেছেন, সমাজের দোষত্রুটি না দেখাইলে তাহার প্রতীকারের আকাঙ্ক্ষা জাগে না, দোষত্রুটি দেখাইতে হইলেই অনেক গুপ্তকথা, অনেক নোংরা ব্যাপার, অনেক অকথ্য অশ্রাব্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, রুচিবাগীশ বা নীতিবাগীশদিগের মুখ চাহিয়া রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে চলিবে না। প্রকৃত সুনীতি বজায় করিবার জন্যই Conventional কৃত্রিম সুনীতির খাতির ছাড়িতে হইবে। বিখ্যাত লেখক বার্ণার্ড শ 'সমাজ বেশ্যাবৃত্তির জন্য কতটা দায়ী' এই বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে রচিত 'Mrs Warren's profession' নামক নাটকের প্রারম্ভে প্রদত্ত (The Author's Apolgy) গ্রন্থকারের কৈফিয়তে এই কথাটা চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বলিবারও অনেক কথা আছে।

প্রথম কথা, জীবতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের সহিত এই সাম্যপ্রদর্শন (analogy) আমাদের কাছে গোঁজামিল বলিয়া বোধ হয়। জীবতত্ত্ব বা শরীরতত্ত্বের শিক্ষার্থীর নিকট যখন জীবদেহের সংস্থানের অথবা শারীরক্রিয়ার সত্য সকল উদ্ঘাটিত হয়, তখন শিক্ষকের বা পুস্তকের ভাষায় বা ভাবে এমন কিছু থাকে না, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার, প্রবৃত্তির উন্মাদনার সৃষ্টি করে। (dissection, vivisection) শবব্যবচ্ছেদ ও জীবন্তদেহ-ব্যবচ্ছেদ-দর্শনে বরং নিবৃত্তির, নির্ব্বেদের সঞ্চার হয়। (এ ক্ষেত্রেও যদি কাহারও উত্তেজনা ঘটে তবে সে নিতান্তই অদ্ভুত লোক।) পক্ষান্তরে, কাব্যরসে অভিষিক্ত realstic বাস্তব-চিত্রদর্শনে অনেক সময় উত্তেজনা-উন্মাদনার আবির্ভাব হয়—বিশেষতঃ অপরিণতবয়স্ক অগঠিতচরিত্র, ভাব-প্রবণ পাঠকপাঠিকার মনে। কঙ্কাল নাড়াচাড়া করিয়া অস্থিবিদ্যা শেখা, আর রবিবাবুর 'কঙ্কাল' গল্পে সেই কঙ্কালমধ্যস্থ মানবীর আত্মা কবিকল্পনার প্রভাবে রক্ত-মাংসে শোভিত হইয়া লালসাময়ী যুবতী বিধবার উদ্দাম প্রেমের আত্ম-কাহিনী মোহকর ভাষায় বিবৃত করিতেছে তাহা শ্রবণ করা, *—এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, গুরুমুখে শরীরতত্ত্বের উপদেশগ্রহণে বা হাতে-কলমে পরীক্ষা (experiment) এবং কবির তূলিকায় উজ্জ্বল বর্ণে জীবন্তবৎ চিত্রিত বাস্তব (realistic) চিত্রদর্শন, এতদু-ভয়ের মধ্যেও সেই প্রভেদ। প্রথমটি যেমন নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করা যায়, দ্বিতীয়টি তেমন

* এটা কেবল উপমাচ্ছলে বলিলাম। ইহা হইতে কেহ যেন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন, যে, লেখক রবিবাবুর 'কঙ্কাল' গল্পে সুরুচি ও সুনীতির তরফ হইতে দোষারোপ করিতেছেন।

নির্লিপ্ত-নির্ব্বিকার-ভাবে গ্রহণ করা যায় না, নতুবা শুষ্ক বিজ্ঞান ও সরস কাব্যে প্রভেদ রহিল কি ? এই প্রভেদ মনে রাখিয়া যদি কবিগণ (realistic) বাস্তববর্ণনাকালে একটু সাবধানতা (reticence) অবলম্বন করেন, লেখনী একটু সংযত করেন, একটু চাপিয়া যান, একটু রাখিয়া-ঢাকিয়া লেখেন, তাহা হইলেই ভাল হয় না কি ?

জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে কাব্যের বিষয়ীভূত হইবে, এমন কোন কথা নাই ; প্রকৃত কবি বিষয়-নির্ব্বাচনে বিচার-শক্তির প্রয়োগ করিবেন, কোন্‌টা চিত্রপটের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, কোন্‌টা বাদ দিবেন, কোন্‌টুকু রাখিবেন, কোন্‌টুকু ঢাকিবেন, এ বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিবেন। এইখানেই খাঁটি ও ঝুটা কবির প্রভেদ। মানব-শরীরের নগ্নতা অশোভন, সাহিত্যেও নগ্ন বস্তুতন্ত্রতা সেইরূপ অশোভন। বার্ণার্ড শ বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার নাটকে উত্তেজক কিছু নাই, চিন্তার উদ্রেক করিবার উপকরণই আছে ('as problems for thought instead of as aphrodisiacs, to induce not voluptuous reveries but intellectual interest')—তাহার উপর কথা নাই। তবে সকল realistic বস্তুতন্ত্রবাদী লেখকই কি এ কথা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন ? ফলতঃ যে সকল চিত্র দ্বারা সুকুমারমতি যুবক-যুবতীর চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা, সে সকল চিত্র কাব্যচিত্রশালা হইতে নির্ব্বাসিত করাই সদ্‌যুক্তি।

অবশ্য, আমরা পাপের চিত্রমাত্রকেই কাব্যচিত্রশালা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার রায় দিতেছি না। যে সব চিত্রদর্শনে পাপের প্রতি ঘৃণা বা আতঙ্কের উদয় হয়, সে সব চিত্র পাপের চিত্র বলিয়াই বর্জ্জনীয় নহে। বরং তাহাতে পাপের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে বলিয়া তাহা উপকারী। কিন্তু যে সব চিত্রে উত্তেজক উন্মাদক উপাদান আছে, চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সব চিত্র উদ্‌ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরিণতবয়স্ক লোকে হয় ত এ সব চিত্র-দর্শনে অবিচলিত থাকেন ; কিন্তু অগঠিত-চরিত্র যুবক-যুবতী সকলেরই যে এরূপ সুবুদ্ধি হইবে, তাহা বলা যায় না।

জানি, আমাদের এই ব্যক্তিগত মত লইয়া এক শ্রেণীর রসজ্ঞগণ স্কুলমাষ্টারী রুচি ও নীতিজ্ঞান বলিয়া টিটকারী দিবেন। তথাপি আমরা যথাজ্ঞান এ বিষয়ে মত প্রকাশ করিলাম, বিচারের ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুণ্ডিচা-গৃহ

উল্টারথ শেষ হইতেই গুণ্ডিচা-বাড়ীর সমারোহ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহা একরূপ পরিত্যক্ত বলিলেও হয়।

নরেন্দ্র-সরোবরে জগন্নাথের শুধু ভোগ-মূর্ত্তিই নীত হইয়া থাকে; কিন্তু গুণ্ডিচা-গৃহের সহিত দারু-ব্রহ্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। রথযাত্রা উপলক্ষে দারুময় প্রধান মূর্ত্তিত্রয় সপ্তদিবসের জন্য * শ্রীমন্দির হইতে বড় দাণ্ডের শেষ প্রান্তস্থিত গুণ্ডিচা-মণ্ডপে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। গুণ্ডিচালয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের মহাবেদী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (উৎকলখণ্ড, ২৯, ১৪)। বৈষ্ণবগ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ দেখা যায়—"গুণ্ডিচা-মণ্ডপ অশ্বমেধী যজ্ঞস্থান" (জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১০৯)। হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবানের এ স্থানে গমনকালে "জয় কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিলে আর মাতৃগর্ভবাসজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, (উ, খ, ৩৩, ৭১) এবং নিকটস্থ বিন্দুতীর্থে (ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (উ, খ, ৪, ৬)। গুণ্ডিচায় গমনকালে দেবদেব জগন্নাথের সম্মুখে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয় পুণ্যপ্রদান করে বলিয়া বর্ণিত আছে (উ, খ. ৩১, ৮৭)।

লৌকিক প্রবাদমতে গুণ্ডিচাদেবী ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী ছিলেন। উৎকলখণ্ডে গুণ্ডিচাখ্য উৎসব ও গুণ্ডিচা-মণ্ডপের উল্লেখ দেখা যায় বটে, (উ, খ, ২২অ, ৩৪, ৩১অ, ৭১, ১১১, ৩৩অ, ৭১, ৮৭, ৩৪অ, ৬, ৩২) কিন্তু গুণ্ডিচা-নাম্নী রাজমহিষী-সংক্রান্ত কোনও বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই। ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষীর নাম দেখিতে পাই মালাবতী (চৈতন্যমঙ্গল, সা, প, সংস্করণ পৃঃ ১২০)। 'গুণ্ডিচা' শব্দ যে গুঁড়ি অথবা বৃক্ষকাণ্ড-বাচক হওয়াই সম্ভব, এ কথা ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুপূর্ব্বেই নিজগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উড়িয়া ভাষায় কাঠবিড়ালীর নাম "গুণ্ডিচা মুষা" অর্থাৎ গুঁড়ির ইঁদুর বা কাঠের ইঁদুর। দাক্ষিণাত্যে এক প্রকার লকড়িপরব (stick festival) "গুণ্ডিচা প্রতিপদ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলখণ্ডমতে মাঘের শুক্লা পঞ্চমী, চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী কিংবা পুষ্যা-

---

* "দিনানি নাত্তত্র কৃষ্ণো বসতি মণ্ডপে।"—উৎকলখণ্ড, ৩৪, ৩২।

নক্ষত্রযুক্তা আষাঢ়মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল। (উ, খ, ২৯, ৩১-৩২)। পুরুষোত্তমের ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানাদি যে একবারে দাক্ষিণাত্যের সাদৃশ্য বর্জ্জিত, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না এবং দেশভেদে তিথিভেদ ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য ঘটাও অসম্ভব নহে।

সরকারী গেজেটিয়ার গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ওম্যালি মহাশয় (**Mr. L. S. S. O'Melley**) 'গুণ্ডিচা' শব্দ প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত মণ্ডপার্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকলখণ্ড গ্রন্থ যে সময় রচিত হয়, তখন যে গুণ্ডিচায় দারুনির্ম্মিত 'মণ্ডপে'র পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"রত্নস্তম্ভময়ে স্বর্ণবেদিকোপস্কৃতান্তরে।
প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপ-সমুজ্জ্বলে॥
সাধু-সোপানঘটিতে চতুর্দ্বারোপশোভিতে।"

(উ, খ, ৩৪, ১১২)

* * * * *

'উহার (গুণ্ডিচামণ্ডপের) স্তম্ভ সকল বিবিধ রত্নদ্বারা খচিত, অভ্যন্তর স্বর্ণ-বেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে এবং উহার সর্ব্বস্থানে সুধালেপনে সমুজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। ঐ মণ্ডপ সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বার-চতুষ্টয়ে বিভূষিত হইবে।' গ্রন্থকার স্বয়ং তৎকালে স্তম্ভ প্রাচীর-সমন্বিত, দ্বারাদি-বিশিষ্ট যে "গুণ্ডিচা" মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহারই ছায়া যে এ বর্ণনায় আরোপ করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। উড়িয়ারা গুণ্ডিচা-গৃহকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী বলিয়া থাকে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি নিজকন্যা সত্যবতীকে পত্নীরূপে প্রভু জগন্নাথের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। (চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১২০) সে হিসাবে গুণ্ডাবাটী জগন্নাথের শ্বশুরালয়ও বলা যাইতে পারে। জগন্নাথ সত্যবতীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "প্রতিবৎসর অন্তরে" বিবাহ করিবেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিয়াছিলেন—

"গুণ্ডিচা মণ্ডপ তোমার সরোবর-জলে
প্রতি বৎসর জাব রথযাত্রার ছলে।"

(চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১২২)

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যমখণ্ডে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একদা রথযাত্রার পূর্ব্বে, কাশী-মিশ্র, তুলসী পরিছা ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিয়া 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা' মাগিয়া লইয়াছিলেন। দেবতার মন্দির বা তৎসংলগ্ন স্থানাদির প্রতি এই যে ভক্তি, তাহা হিন্দুর চক্ষে বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ইহা শুধু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব নহে। যে অপ্পর স্বামীর স্তোত্র দাক্ষিণাত্যের শৈবমন্দিরে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে, তিনি বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক "খুর্পীর" ন্যায় একপ্রকার তৃণোৎপাটন-যন্ত্র হস্তে করিয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রাঙ্গণ প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। (Havell's Ideal's of Indian Art p. 114) সিংহলের কলম্বো যাদুঘরে রক্ষিত অপ্পর স্বামীর ধাতবমূর্ত্তির যে চিত্রটি শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় নিজগ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার হস্তে 'খুর্পী' রহিয়াছে দেখা যায়।

চৈতন্যদেব স্বহস্তে গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন করিয়া নিজবস্ত্রে সিংহাসন পরিষ্কার করিয়াছিলেন। (নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন। মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মাজ্জি সিংহাসন ॥)

"* * *
একলে প্রেমাবেশে করে শত জনের কাম ॥
শতহাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥"

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

ভক্তগণ শত ঘট ও শত সম্মার্জ্জনী লইয়া—

"ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥
তৃণ ধূলি ঝিঁকুড়ি সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥"

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

এইরূপে ভোগমন্দির, নাট্যশালা, পাকশালা, অন্তঃপুর প্রভৃতি সমস্তই প্রক্ষালিত হইল—'ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি' কিছুই বাকী রহিল না।

শ্রীচৈতন্য অনুচরগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য আপনার হাতে তৃণ, কাঁকর, কুটা প্রভৃতি কুড়াইতে লাগিলেন—বলিলেন,

"কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠা পানা লব॥"

চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা বলিয়াছেন—

"এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥"

এইরূপে মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দির সংমার্জ্জনপূর্ব্বক নিজ সুস্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ভগবানের উপবেশনযোগ্য করিয়াছিলেন।

"স্বচিত্তবচ্ছীতসমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশোপয়িকং চকার॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গুণ্ডিচামার্জ্জন বর্ণনা আরও মনোজ্ঞ, আরও সুললিত।

"পাণৌ কৃত্বা মধুরমৃদুলে শোধনীমূর্দ্ধমূর্দ্ধং
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচামণ্ডপান্তঃ।
লূতাতন্তূন্ মলিন রজসঃ সারয়ন্নেব তৈস্তৈ-
র্ব্যাপ্তো গৌরঃ শশধর ইব ব্যক্তলক্ষ্মা বভূব।"

"মধুর কোমল হস্ত-কমলে আপনে।
সম্মার্জ্জনী লইয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট-মনে॥
লূতা-তন্তু-রজ ঊর্দ্ধে যতেক আছিল।
মার্জ্জনীতে করি তাহা সব ঘুচাইল॥
লূতাতন্তু-রজ সব লাগিল শরীরে।
কলঙ্ক হইল ব্যক্ত যেন শশধরে॥"

মন্দির-সেবায় মহাপ্রভুর সঙ্গী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও উৎসাহের বিষয় উল্লেখ করিয়া কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"কেচিদ্গৌরগিরা মনোজ্ঞতময়া সিঞ্চন্তি সিংহাসনং
ভিত্তিঃ কৈন চৈকেঽপি তস্য করয়োর্ব্যাপর্ণং কুর্ব্বতে।"

"কেহ প্রভু-আজ্ঞায় সিঞ্চিয়ে সিংহাসন।
কেহ ভিত্তি চতুর্দ্দিকে করে প্রক্ষালন॥"

শেষে সেই একই কথা—

*　　*　　*
এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল॥
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর।
ঐছে নিষ্কম্বর আর পরমশীতল॥"

গুণ্ডিচা-সেবা সমাপ্ত হইলে গৌরহরি স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত তথায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরও গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে অচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করার উল্লেখ দেখিতে পাই। (চৈ, চ, মধ্যলীলা পৃঃ ১৯৯)

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে—

"সেই হৈতে সেবা গুণ্ডিচা-মন্দিরে।
অদ্যাপিহ গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব করে॥"

আমরা রথের কিছু দিন পূর্ব্বেই গুণ্ডিচা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিও এ প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। লোকোত্তর মহাপুরুষগণ যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও সহজে ভক্তগণের স্মৃতিবহির্ভূত হয় না।

জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডাবাটী প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও শিখর, নাটমন্দির, জগমোহন, বেদী প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, এমন কি, রন্ধনশালা প্রভৃতিও বাদ যায় নাই। মন্দিরের চারিদিক্ খাঁজকাটা প্রাচীরে ঘেরা। ইহার কিয়দংশ ২০ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট ২ ইঞ্চি স্থূল। ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ও গাছপালা; বাহির হইতে দেখিলে অনেকটা বড় বাগান-বাড়ীর মতই বোধ হয়। প্রবেশদ্বারের উপরেই নবগ্রহ-প্রস্তর—উড়িয়া মন্দিরের ইহা বিশেষত্ব বলিয়া পরিচিত। ভুবনেশ্বর, কোণার্ক, পুরুষোত্তম সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতে পাইবেন। আচার্য্য ব্লক অনুমান করিয়াছেন, (Annual report arch survey 1903-4 p. 47) যে কোনরূপ মন্দ-প্রভাবজনিত অনিষ্ট যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই দ্বারের উপর নবগ্রহ-প্রস্তর

(Architrave) সংস্থাপিত হইয়া থাকে। নবগৃহে প্রবেশকালে গ্রহশান্তি করার প্রথা যে এতদ্দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে, আচার্য্যপ্রবর তাহাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা যায় না বটে, কিন্তু শৈব মন্দিরাদিতে একটি বিভিন্ন মণ্ডপে নব-গ্রহমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। (Gopinatha Row's Elements of Indian Iconography Vol. I Pt. II p. 300) এই নয় মূর্ত্তির মধ্যে কোনটিকেই অন্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া সংস্থাপন করার নিয়ম নাই। মাহুরা মন্দিরে শতস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র নবগ্রহমণ্ডপ রহিয়াছে, তাহার মধ্যদেশে সূর্য্যদেব অবস্থিত এবং অপর আটটি গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও সোম এবং রাহু ও কেতু তিনটি বিভিন্ন পংক্তিতে বিভিন্ন বিভাগে সাজান। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও মহাশয় বলিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও মতে মন্দির নির্ম্মাণ-কালে অন্তরীক্ষে গ্রহগুলির যেরূপ অবস্থান লক্ষিত হয়, সেই অনুসারেই মণ্ডপমধ্যে তাহা-দিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলির অবস্থিতি দৃষ্টে গণনা করিয়া নাকি মন্দিরনির্ম্মাণকাল নিরূপণ করা চলে। উৎকলের নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি এ মতবাদের কিঞ্চি-ন্মাত্র সমর্থন করিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, এগুলিতে সূর্য্য, সোম প্রভৃতি মূর্ত্তিসমূহ একই প্রথায় পর পর সাজান, কেবল ভুবনেশ্বরের একটি মন্দিরে দেখা গিয়াছে যে, গ্রহ-শিলায় কেতুর মূর্ত্তিটি একবারেই স্থান পায় নাই। সম্ভবতঃ স্থানাভাবে বা অপরিপক্ক ভাস্করের বেহিসাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

আমাদিগকে নবগ্রহের তক্ষণনৈপুণ্য অধিকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে হয় নাই। দ্বারদেশস্থ পাণ্ডারূপী দৌবারিক মহাশয় দর্শনী কবুল করাইয়া অনতিবিলম্বেই ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা মন্দিরগুলি তো ভাল করিয়াই দেখিয়া-ছিলাম, রত্নবেদী স্পর্শ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হই নাই।

মঙ্গলাপঞ্জীর মতে গুণ্ডিচার বিমান ও জগমোহন শ্রীমন্দিরেরই সমসাময়িক; বিমানাংশ উচ্চে ৭৫ ফিট্ এবং বাহিরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফিট্। গুণ্ডিচা-গৃহের বহির্দ্দেশে কিছু পঙ্খের কাজ আছে। 'মহাবীর' অঞ্জনানন্দন প্রভৃতির আধুনিক চিত্রেরও অভাব নাই। ভিতরের লম্বা হলের (hall) যে অংশটি গির্জ্জাঘরের nave বা মধ্যভাগ সদৃশ, সেখানেও অনন্ত-শয্যা, সীতার বিবাহ ও পৌরাণিক যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির চিত্র রহিয়াছে। হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। এ স্থানটি এরূপ অন্ধকার যে, বেদীর উপর কোন কারু-কার্য্য আছে কি না, কিছুই বুঝা গেল না। প্রস্তর-খোদিত যে সকল পুরাতন চিত্র মন্দির-মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিলাম, তাহার উপর সযত্নে চূণকাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝের এই সুবৃহৎ ঘরটি চওড়ায় ১৭ ফিট্ হইবে এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠদ্বয়ের

প্রশস্ততা ৮ ফিট্ ৭ ইঞ্চি করিয়া। (Mittra's antiquities of Orrissa P. 139, Vol I) গুণ্ডিচার ভোগমন্দিরের একটু বিশেষত্ব আছে; ইহা আয়ত (oblong) আকৃতিবিশিষ্ট, অন্য মন্দিরের ভোগমণ্ডপের ন্যায় সমচতুকোণ নহে। শ্রীমন্দিরের রত্ন-বেদী ও গুণ্ডিচা-বেদী উভয়েই উচ্চতায় ৪ ফিট্ মাত্র, কিন্তু দৈর্ঘ্যে পার্থক্য আছে; রত্ন-বেদী লম্বে ১৬ ফিট্, কিন্তু গুণ্ডিচা-বেদী ১৯ ফিটের কম নহে; (op. cit) উভয় বেদীই ষ্টিয়াটাইট (steat te) কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বেদীটি কিরূপ সম্মানিত হয়, জানি না; তবে শ্রীমন্দিরের বেদী পবিত্রতায় বিগ্রহত্রয়ের সমতুল্য জ্ঞানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে, এ কথা অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি।

গুণ্ডিচা-বাড়ী না কি জগন্নাথের বিলাস-গৃহ। কোথায় পড়িয়াছিলাম, "এতৎ ন গুণ্ডিচা-গৃহং" প্রভৃতি শ্লেষবাক্যে বিদগ্ধা-প্রণয়িনী জগবন্ধুর কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং এখানে যে সম্ভোগ-চিত্র দেখা যাইবে, তাহাতে আব আশ্চর্য্য কি? এ গুলি পঙ্খের কাজ, তাহাও আবার পুরাতন নহে; শুনিতে পাই, প্রাচীনত্বে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসরের বেশী হইবে না। Les Monuments de L'Inde (ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন) নামক গ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুস্তাভ লে বঁ (Dr. Gustave le Bon) গুণ্ডিচা-বাড়ীর কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মতে এই মন্দিরটি জগন্নাথ-মন্দিরের সমসময়েই নির্ম্মিত। মসিয়ে বঁ বলিয়াছেন, "পবিত্রতায় হিসাবে জগন্নাথের মন্দিরের পরেই গুণ্ডিচা-গৃহের স্থান। কিন্তু এখানে প্রস্তরে খোদিত বা গৃহপ্রাচীরে নানাবর্ণে রঞ্জিত যে সকল চিত্র চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, অশ্লীলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সেগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত কুৎসিত (particulierement hideuses) নিকটস্থ ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিলে, এমন কি, পুরীর মন্দিরের কয়েকটি খোদিত দরজার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও এগুলি শিল্পকলার যে কি অত্যধিক অবনতি সূচিত করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। একই জাতিকর্ত্তৃক যে এরূপ নিতান্ত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে স্বীকাব করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে না। গুণ্ডিচা বাড়ী সমুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া গুণ্ডিচা-গড় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। লে বঁ সাহেব নিজ পুস্তকে ভ্রমক্রমে 'গুণ্ডিচা-গড়ী' লিখিয়াছেন।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

সমালোচনা

প্রবর্ত্তকের আদর্শ।—দেশ ও জাতি সেবার উচ্চতম ব্রত লইয়া গত চার বৎসর হইতে "প্রবর্ত্তক" কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাঙ্গলার এই যুগসন্ধিক্ষণে "প্রবর্ত্তকের দল" জাতীয় জীবন গঠনোপযোগী এক আদর্শ প্রচার করিতে চাহেন এবং উক্ত আদর্শকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার জন্য বাঙ্গলার উদীয়মান যুবক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতেছেন। প্রবর্ত্তকের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা করা এক কথা, আর বিনা বিশ্লেষণে, পরের ভাব নির্ব্বিচারে গিলিয়া ফেলা আর এক কথা! আমরা বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, প্রবর্ত্তকে এক শ্রেণীর ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, উহার নিম্নে লেখকের নাম না থাকিলেও ঐগুলি যে একই ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত, ইহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাষা আছে, তেজ আছে, লেখকের আত্মশক্তির উপর একটা বিশ্বাসেরও আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দার্শনিক বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া যেখানেই লেখক মহাশয় উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চাহেন, সেইখানেই তাঁহার ভাব অস্পষ্ট এবং যুক্তিগুলি আড়ষ্ট হইয়া পড়ে!

প্রবর্ত্তকের নবম ও দশম সংখ্যায় প্রকাশিত "অধ্যাত্ম-যুদ্ধ" ও "সাধন-পথ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ই উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ে লেখক মহাশয় প্রবর্ত্তকের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতই আশান্বিত হইতে পারি নাই। উহার মধ্যে প্রথমেই প্রাচীনের প্রতি, অতীতের প্রতি একটা বিদ্রোহের সুর স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন, "অতীতের সকল শক্তিই আমাদের পরাজয় ঘটাইবার জন্য বীরমদে যুদ্ধ করিবে; এমন অসাধারণ কে আছ, সকল সহায় হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতে নূতন জীবন বহিয়া আনিবার জন্য আমাদিগের সহিত যোগদান করিবে?"

কারণ, লেখকের মতে পূর্ব্বের সমস্ত আদর্শগুলিই বোধ হয় খণ্ড ও অশুদ্ধ; অতএব "ঐগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া উহাদের সত্তায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলার যে প্রণালী, যে সাধনা—তাহার নামই আত্মসমর্পণযোগ।" আমাদের মনে হয়, ইহাই প্রবর্ত্তকের আদর্শ এবং ইহার সাধনা—"কিছুকে ছাড়াইয়া এড়াইয়া নহে, সমস্তকে ভরাইয়া পূর্ণ

করিয়া নূতন ভাবে জীবন গঠন করাই এ যোগের উদ্দেশ্য।" কারণ, "কোন জিনিষকে অতিক্রম করিয়া চলা, আর উহাকে জয় করিয়া স্ববশে আনা, দুয়ের প্রভেদ অনেকখানি।" এড়াইয়া বা ছাড়াইয়া যাওয়া যখন লেখক মহাশয়ের আদর্শের অনুকূল নহে, তখন সম্ভবতঃ জয় করিয়া স্ববশে আনাই লেখকের মত। কিন্তু কয়েক লাইন পরেই লেখক বলিতেছেন—"জয় নহে, প্রকৃতি অপরাজেয়।"

কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রকৃতির সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে হইয়াছে। তিনি বুদ্ধি, মন, প্রাণের মধ্যে গণ্ডী টানিয়া তাঁহার সাধনক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধন-পথে সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। কারণ, গণ্ডীর বাহিরে শত্রুর অধিকারে পা দিলেই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা—সদাই ভয়, সদাই সঙ্কোচ।

এই বিষয়টি অনুভূতির মধ্যে আনিতে না পারিয়াই "শঙ্কর হইতে বিবেকানন্দের যুগ পর্য্যন্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতের সাধনা, তাই ইহ বিমুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। * * পরমাত্মলাভের পথে অন্তরায়গুলিকে হয় ধ্বংস করিয়া, নয় অতিক্রম করিয়া, নয় নিগৃহীত করিয়া মানুষ ছুটিয়াছে।"

আমরা অধ্যাত্মযুদ্ধ প্রবন্ধটি আলোচনায় অগ্রসর হইয়া প্রথমে দেখিয়াছি, লেখক প্রকৃতিকে জয় করিবার পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন। আবার প্রকৃতিকে অপরাজেয় ভাবিয়া, তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। এইখানেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হয় নাই—আবার বলিতেছেন, "যে শক্তি বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে, তাহার আনুকূল্য করিবারও যথেষ্ট স্পর্দ্ধা আছে, আমরা প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই চলিয়াছি—ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন আমাদের অবসন্ন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা প্রকৃতিকে সাহায্য বা পরিপুষ্ট করিতে জন্মি নাই, বরং উহাকে জয় করিতে জন্মিয়াছি।" খুব সম্ভব, ঘন ঘন মতপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া লেখক এই কথাটিরই প্রতিবাদ করিতে চান। কারণ, তিনি অনুভব করিয়াছেন, "এই উৎকট অক্ষমতামূলক বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে ভগবানের জলদগর্জ্জন ভারতের জীবন চমকিত করিয়া তুলিয়াছে।"

একটা সদা-জাগ্রত সংগ্রাম-সহায়ে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিয়া, আত্মার মহিমাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার যে সাধনা—তাহা কি উৎকট অক্ষমতামূলক বৈরাগ্য? তাহা কি বিশ্বকে উপেক্ষা করিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে অপমান করা? আর জগতের রূপ, রস, গন্ধকে বরণ করিবার জন্য প্রকৃতির সহিত আপোষ করিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে পা ভাসান

দিলেই মর্ত্তের রেখায় ভগবান্ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেন—আর বাহির হইয়া পড়িবে নিগূঢ় রহিয়াছে যে অমৃতময় সত্তা?

হেগেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর দার্শনিক Pragmatic মতবাদের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন; প্রবর্ত্তকের লেখক কি সেই প্রচ্ছন্ন ভোগ-বাদকে জাতীয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন? এ সন্দেহ করিবার আমাদের যথেষ্ট হেতু আছে, কারণ, "সাধন-পথ" প্রবন্ধটিতে লেখক যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন--"প্রাচীন যোগপদ্ধতি যদি প্রকৃষ্ট হইত, তবে এই হাজার হাজার বৎসর, উপনিষদের বলপ্রদ ধর্ম্মলাভ করিয়াও হিন্দু-জাতি এমন হীন, এমন দুর্ব্বল, এমন স্বার্থপর কেন?"

প্রবর্ত্তকের আদর্শের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেখকের অদ্বৈত-ভীতির আমরা বহুবার পরিচয় পাইয়াছি; এবং ইহা বুঝিতেও অধিক বিলম্ব হয় না যে, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধনের মধ্য দিয়া না গিয়া কেবলমাত্র বুদ্ধি-সহায়ে সু-উচ্চ অদ্বৈত-গিরিশিখরে আরোহণ করিতে গেলে, শিরোঘূর্ণন অবশ্যম্ভাবী; প্রবর্ত্তকের লেখকেরও তাহাই হইয়াছে!

পরমাত্মলাভ করিতে হইলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া আত্মার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। আর এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই প্রকৃতি যে সমস্ত বাধা, বিপত্তি, বেষ্টনী-সহায়ে সাধককে বাধা প্রদান করে, সেগুলির সহিত কি বিরামহীন সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা সাধকমাত্রেই অবগত আছেন! এই সংগ্রামের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ—অপক্ষপাতিনী প্রকৃতির নিকট আনুকূল্যলাভের আশা দুরাশা মাত্র। প্রবুদ্ধ আত্মসংবিৎ লইয়া তাহার সহিত যুদ্ধই করিতে হয়। ইহাকেই শাস্ত্র তপস্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই সংগ্রামে বিমুখ-হইয়া যন্ত্রবৎ প্রকৃতির ছন্দানুবর্ত্তন করা—উহা "আত্মসমর্পণযোগ" হইতে পারে, কিন্তু শক্তিলাভের, ভগবান্-লাভের পন্থা কিছুতেই নহে—ইহা ভারতের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

প্রবর্ত্তকের আত্মসমর্পণযোগী যে তপস্যায় বিমুখ হইতে চাহেন, ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে গেলেই যে অনিবার্য্যরূপে সেই তপোভাব আসিয়া পড়িবে। "আমি ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম"—এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তো প্রহ্লাদ হওয়া যায় না? প্রবৃত্তির মোহ, ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য এ সকলকে দমন করিতে হয়! ভগবানের মহিমা আমার জীবনের মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিবে, এই দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া যে সাধক কর্ম্মের পথে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাকেও পরিপূর্ণভাবে আত্মদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, অনেক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়, অনেক বাধা পায়ে দলিতে হয়। অদ্বৈতবাদী বা ভক্ত কাহারও সাধনা জগৎকে উপেক্ষা করিয়া, বঞ্চিত করিয়া নহে—ইহ

প্রবর্ত্তক-লেখক হিগেল-দর্শনে না খুঁজিয়া ভারতের অধ্যাত্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন, "নিষ্কামভাবে ভগবানের চরণে যে আপনাকে উৎসর্গ করিবে"—তাহাকেও নিষ্কাম হইবার জন্ত প্রকৃতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে। এই সংগ্রামে জীবন অবসন্ন :হইয়া পড়ে না—বরং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিই জাগ্রত হইয়া উঠে।

"উপনিষদের বলপ্রদ ধর্ম্ম লাভ করিয়াও হিন্দুজাতি এমন হীন, এমন দুর্ব্বল, এমন স্বার্থপর কেন ?"—এ সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া স্বামীজী, হিন্দুর ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান আলোড়ন করিয়াছিলেন যথেষ্ট। এই সমস্যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনীষী রামমোহনের সম্মুখেও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ইহার মীমাংসাকল্পে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বেদান্তালোচনার সূত্রপাত করিয়া যান। রামমোহন-সমর্থিত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় জাতির কি কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মনেতৃগণ উহা পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, এমন কি, যে বেদ-বেদান্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া দাবী করেন, সেই বেদ বা বেদান্তকেও তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র বিশ্বে অদ্বৈতবাদ পুনঃপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অদ্বৈতবাদ-প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই কার্য্যের জন্ত তিনি চাহিয়াছিলেন কয়েক শত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক—যাহারা সমগ্র জগতে সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিবে। অদ্বৈতবাদ না হউক, সনাতনধর্ম্ম-প্রচারকল্পে যে কয়েক শত সাধকের প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে দেখিতেছি, প্রবর্ত্তকের লেখকও একমত—কেবল একমত কেন, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"স্বামীজীর এই অসমাপ্ত কার্য্য সফল করিবার জন্য—এখনও তাঁর বজ্রকণ্ঠের কঠোর আহ্বানে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে!" আমরা "সন্ন্যাসীই হইতে চাই, কিন্তু এই সন্ন্যাস এমন কিছু নহে, যাহা ভগবানের সর্ব্ববিভূতি-প্রকাশে বাধা প্রদান করিবে। তাঁর অনন্ত শক্তি ও সম্পদ্ আমাদের ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইবে, আমরা হইব প্রণালী—কেবল ধর্ম্মপ্রচারের ভেঁপু নহে, কর্ম্মের সকল উপাদানই আমাদের ভিতর দিয়া আবির্ভূত হইবে।" বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের যে আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রবর্ত্তকের সাধনপথের পরিপন্থী বলিয়াই লেখক বলিয়াছেন—"তিনি যে সন্ন্যাসীর রূপ দিয়াছিলেন, আমরা মাত্র সেই রূপের একেবারেই পরিবর্ত্তন করিব।" বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের সহিত প্রবর্ত্তকের সন্ন্যাসের বিরোধ কোথায়, অসামঞ্জস্য কোথায়, তাহা লেখক বুঝাইবার বা বিচার করিবার চেষ্টা আদৌ করেন নাই, কেবল সরাসরি রায় দিয়া গিয়াছেন—"তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া, প্রাচীন শঙ্কর ও বৌদ্ধ-প্রভাবে আপনাকে

কিছু পরিমাণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।" নিতান্ত অসংবদ্ধভাবে এই দুই লাইন বাচা-লতা প্রকাশ করিয়া লেখক বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন!

শঙ্করের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধের হৃদয় সম্মিলিত হইয়া বিবেকানন্দের মধ্যে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উহা আপনাকে হারাইয়া ফেলা নয়, বরং এইখানেই তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মহিমাময় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে! বর্ত্তমানকে অতীত হইতে ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না—অতীতই বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে, ধারণ করে, প্রেরণা দেয়—এ সত্যকে অস্বীকার বোধ হয় প্রবর্ত্তকের লেখকও করিবেন না।

অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বিবেকানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসকে প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন বলিয়াই কি লেখক বলিতে চাহেন, "আমরা সেরূপ সন্ন্যাসকে প্রশ্রয় দেই না, যে সন্ন্যাসে আপনাকে কিছু হইতে বঞ্চিত করিতে হয়, অথবা তাহা অপরের নিকট চাহিয়া লইতে হয়?"

"একটা নূতন কিছু" করিবার প্রবল মোহময়ী উন্মাদনায় প্রবর্ত্তকের লেখক আত্মহারা হইয়া যে অর্থহীন কতকগুলি কথার মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রুতিমধুর হইলেও যুক্তিসঙ্গত নহে। বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের আদর্শ যত সহজে বুঝা যায় বলিয়া প্রবর্ত্তকের লেখকের বিশ্বাস, বস্তুতঃ তাহা তত সহজ নহে।

যে সিংহগ্রীব সন্ন্যাসী মহিমামণ্ডিত শির উর্দ্ধে তুলিয়া বলিতেন, "যে পর্য্যন্ত দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমি মুক্তিকামনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; অথবা সর্ব্বমুক্তি না হইলে আমার মুক্তি হইতে পারে না।" তাঁহার সন্ন্যাসের মধ্যে "আপনাকে বঞ্চিত করা ও জগৎকে ত্যাগ করা" প্রবর্ত্তকের লেখক কেমন করিয়া বুঝিলেন এবং বুঝাইতে প্রয়াসী হইলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলাম না। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী এখনও প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হয় নাই। বাজারে পুস্তকাকারে তাহা পাওয়া যায় এবং সকলেরই তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—এর ধুয়া ধরিয়া অসংখ্য বন্ধনের মাঝে মহা-নন্দময় মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য একদল নব্য সাহিত্যিক মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আর্ত্তনাদ সুরু করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদের নির্লজ্জ ভাষ্য ও টীকার দৌরাত্ম্যে বোধ হয়, স্বয়ং কবি পর্য্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন! এই জ্বালাতেই বাঙ্গলা অস্থির। ইহার উপর ঐ ধুয়া ধরিয়া যদি ভোগবাদী আবার এক দল সন্ন্যাসী দেখা দেন, তবে অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিবে সন্দেহ কি? ত্যাগের সন্ন্যাস বুঝা যায়, ভোগের সন্ন্যাস কিরূপ হইবে, কে জানে? তাহাও আবার শুনিতেছি, অসংখ্য বন্ধনমাঝে? ঐ ভোগ-বাদের মোহে পড়িয়া আজ পাশ্চাত্য জগৎ ছিন্ন-ভিন্ন, ঐ ভোগবাদের মোহে মজিয়া

আজ আমরা দীর্ঘ একটি শতাব্দী ধরিয়া ইতঃ ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট। উহাই যথেষ্ট হইয়াছে! আজ জাতির জীবনে যে জাগরণ ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে বাঙ্গলার স্বাভাবিক পথে বিকাশ হইতে দাও। অনর্থক 'হেগেল-কম্‌-প্র্যাগ্‌ম্যাটিক' বিভ্রাটের প্রয়োজন কি? ক্রমাগত নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন বিক্ষোভিত করিও না। যে সেবাব্রতকে তোমরা "তামসিক ধর্ম্মাচরণ" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছ, অপেক্ষা কর, সেই ব্রতের মহিমাতেই আর্ত্ত, অনাথ, দরিদ্র ও অস্পৃশ্য নারায়ণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন! যদি শক্তি, সাহস ও সঙ্কল্প থাকে, তবে অদ্বৈতানুভূতির দিক্ দিয়া এই সেবাব্রতকে বরণ করিয়া লও—না পার, দূরে দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে অবস্থান কর। এই অদ্বৈত-বেদান্তের ভৈরব নির্ঘোষের সহিত প্রাগ্‌ম্যাটিজিম্‌এর মোহন মূর্চ্ছনা এক সুরে মিলিবে না। অনর্থক শক্তিক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি? আর সংবাদপত্রে প্রতিবাদ? তাহা ত ক্রমে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা, মহাত্মা ডফ, এবং রামমোহনের পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-নেতৃগণ অনেকবার করিয়াছেন। অদ্বৈত-বেদান্ত যদি তাহাতেও না মরিয়া থাকেন, তবে প্রবর্ত্তকের লেখকের এমন কি আশা আছে,—বুঝি না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সম্পাদক-
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

নারায়ণ

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]   [ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

বেণের মেয়ে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

ষোড়শ অধ্যায়

(১)

একদিন পিশাচখণ্ডী জন দুই সাতশতী ব্রাহ্মণ ও সেই বিধুভূষণ ফরফরকে সঙ্গে লইয়া মায়ার গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ঠাকুরঘরে গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র মায়া তাঁহাদের পদধূলি লইল ও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সেই গালিচায় বসাইল, নিজে নীচে মেজের উপর বসিল।

মায়া বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন; আমার দত্তকগ্রহণের একটি দিন করিয়া দিউন। বিশেষ, যখন বাবাঠাকুর আর বেশী দিন এখানে থাকিবেন না, দিনটা কবে স্থির হইল, তাঁহার জানিয়া যাওয়া উচিত।" মস্করী, ফরফর মহাশয়কে বলিল—"আপনি দিনটা স্থির করুন।" ফরফর মহাশয় বলিলেন—"দিন আর কি স্থির করিব? সংক্রান্তিতে হ'তে পারে, পূর্ণিমায় হ'তে পারে, আর যুগাদ্যা তিথিতে হ'তে পারে। সংক্রান্তির মধ্যে আবার মহাবিষুবসংক্রান্তি প্রশস্ত। যুগাদ্যার মধ্যে সত্যযুগের আদি তিথি অক্ষয়-তৃতীয়াই প্রশস্ত। আর পূর্ণিমার মধ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমাই প্রশস্ত। কেমন হে ভায়া—" বলিয়া তিনি হরেকৃষ্ণ মুল্লুককে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুল্লুক মহাশয় দুইবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন—"কি জানেন দাদামহাশয়, ক্রিয়াকর্ম্মটা করিতে গেলে আষাঢ় শ্রাবণ মোটেই ভাল নয়; বসন্তকালটা বেশ। তা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বলি, মহাবিষুবসংক্রান্তিতেই দিন করুন। না হয় আপনি যা বল্লেন, অক্ষয়-তৃতীয়াতেই হউক।

তা তুমি কোন্ দিনটা ভাল বল ধর্‌ধর্ মহাশয়?" তখন দ্বারিক ধর্‌ধর্ মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা এই দুইটা দিনই স্থির করিয়া দিইয়া যাই। তার পর রাজা বিহারী এই দুইটা দিনের মধ্যে একটা দিন ঠিক করুন। তাঁদের উপরও ত একটা ভার থাকা উচিত। তাঁহাদেরও ত রাজকার্য্যের সুযোগ অসুযোগ দেখা চাই। বিশেষ তাঁহাকেও ত দিনকতক পরে পোষ্যপুত্র লইতে হইবে।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক লম্বা খাটলি ঠাকুরবাড়ী ঢুকিল। বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গেই চোপদার, নিশানদার প্রভৃতি অনেক লোক ঢুকিল। খাটলি হইতে নামিয়া রাজা বিহারী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল। মায়া দাঁড়াইয়া উঠিল, পরে পিতার চরণধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণেরা বসিয়াই আশীর্ব্বাদ করিল। মস্করী বলিলেন—"আমরা ত মায়ার পোষ্যপুত্রগ্রহণের দুটি দিন করিতেছি; একটা মহাবিষুবসংক্রান্তি, অপরটি অক্ষয়-তৃতীয়া। এই দুইটি দিনের মধ্যে কোন্‌টি আপনার পছন্দ বলুন, কোন্‌টিতে আপনার সুবিধা বলুন। আর আপনারও ত পোষ্য-পুত্র লইতেই হইবে, তা এই সঙ্গেই যদি ল'ন ত ইহার একটি দিনে আপনি, আর একটি দিনে মায়া পোষ্যপুত্র লউন। এবারে ঐ দুই দিনে দশ পনর দিন তফাৎ বই নয়।" কিছু চিন্তা করিয়া রাজা বিহারী বলিলেন—"সংকল্পিত অর্থে বিলম্ব ভাল নয়—বিশেষ যখন শুভ সংকল্প, আর ইহারই উপর দুইটি বেণে-বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনারা যেমন অনুমতি করিতেছেন, আমরা ঐ দুই দিনেই দত্তক গ্রহণ করি, আমি মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিনে, আর মায়া অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে।" ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"সাধু, সাধু।" তখন রাজা বিহারী বলিলেন—"একটা গোলের কথা আছে। এ ক্ষেত্রে রাজার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন এরূপ কার্য্য হইতেই পারে না। তা তিনি ত সবে সে দিন এখান হইতে গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে আবার তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমি ত পারিব না।"

মস্করী বলিলেন—"ইহার জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না। আমি আপনার জাতির একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা—একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে, আপনাদের জাতির নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, যদি স্বয়ং না আসিতে পারেন, কোন জাতির ছেলেকে পাঠাই-বেন; অন্ততঃ ভবদেব ভট্টের উপর ভার দিবেন। আপনি বেশ কথা বলিয়াছেন, আপনি এখানকার রাজা, সকলে আপনার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের কার্য্যে ত তাহা হইতে পারে না, মায়ার কার্য্যেও তাহা হইতে পারে না।—সে যা হউক, আমি ত এখানে থাকিব না, আমাকে রাজসভার নিমন্ত্রণের জন্য যাইতে হইবে। আপনার জন্য, ভবদেব ভট্টের জন্য, আর মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের জন্য আমাকে ভাটের কার্য্য করিতে হইবে। আমি তাহাতে আমার লাঘব হয় বলিয়া মনে

করি না, বরং গৌরব বলিয়াই মনে করি। আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ডের জন্ম আমি এই তিন জন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছি। ইহাঁরা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধাৰ্ম্মিক ও কৰ্ম্মঠ। ইহাঁদের শূদ্র যজমান আছে। ইহাঁদেরই উপর আপনাদের কার্য্যের সমস্ত ভার দিয়া গেলাম। ইহাঁরা যেমন বলেন, সেইমত আয়োজন করুন। যদি অন্ত ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় ত ইহাঁরাই আনিয়া দিবেন। এই যে বিধুভূষণ ফবৃফর্ মহাশয়কে দেখিতেছেন, ইহাঁর বয়স ৯০ বৎসরেরও উপর। ইহাঁর যেমন ব্রহ্মবৰ্চ্চস, তেমনটি প্রায় দেখা যায় না। ইনিই জীবন ধনীর প্রতিমায় জীবনদান করিয়া তাঁহাকে কথা কহাইয়া মায়ার পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। নহিলে শাস্ত্রানুসারে মায়া ত পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীলোকে পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে না।”

এই কথা শুনিয়া রাজা বিহারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে লইলেন এবং ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন;—“আপনি আমার জামাইয়ের বংশরক্ষা করিয়া দিলেন। আপনাকে আর কি দিব? ফবৃফর্ গ্রামের পূৰ্ব্বদিকে হরিপুর গ্রামখানি আপনাকে দান করিলাম। মহারাজাধিরাজের স্বহস্তাঙ্কিত দানপত্র যথাসময়ে আপনাকে আনাইয়া দিব।” “মহারাজের জয় হউক”—বলিয়া ব্রাহ্মণ দুই হাত তুলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিলেন।

২

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মায়ার গোলায় প্রকাণ্ড উঠানের উপর প্রকাণ্ড পা'ল টাঙান হইয়াছে। পালের নীচে সভার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সভারোহণের জন্ম উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে ৫৬ গ্রামী ও সাতসইকা পরগণার চব্বিশগ্রামী সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারা উঠানের উত্তরদিকে বসিয়াছেন। বেণে চার আশ্রমেরই আছেন, তাহার উপর শঙ্খবণিক্, কংসবণিক্ প্রভৃতিও আছেন। কায়স্থকুলও নিমন্ত্রিত হইয়াছে। বৌদ্ধদের মধ্যেও মাথাল মাথাল লোক সব নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। গুরুপুত্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অনেক ভিক্ষুণীও আসিয়াছেন। সমস্ত উঠানটা যেন জম্জম্ গম্গম্ করিতেছে। সকলের মধ্যস্থলে মহারাজাধিরাজের স্বর্ণসিংহাসন, দুই পাশে দুই রৌপ্য-সিংহাসন। রাজা বিহারী নিজে থাকিয়াই সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন ও মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিতেছেন। উঠানের উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপে হোমের জায়গা হইয়াছে।

উঠানের চারিদিকে চারি দেউড়ীতেই বাজনার রোল উঠিয়াছে। কোন দেউড়ীতে ঢাক, ঢোল ও কাঁসি; কোন দেউড়ীতে দামামা, দগড়া ও বাঁশী; আর এক দেউড়ীতে দুন্দুভি, করতাল ও ঝাঁঝ; আর এক দেউড়ীতে—মৃদঙ্গ বীণা ও করতাল। যখন সব দেউড়ীতে একত্র বাজিতেছে, তখন শব্দের রোলে আকাশ ফাটিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপে দত্তক-গ্রহণের জায়গা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে ঘটস্থাপন করিয়াছে। একটা কলসী, তাহাতে জল পোরা; তাহার উপর আম্রপল্লব, তাহার উপর একটি ডাব ও কলসীর সম্মুখদিকে ৫টি সিন্দূরের রেখা। চণ্ডীমণ্ডপের ডানদিকে হোমের উদ্যোগ হইতেছে ও বামদিকে আভ্যুদয়িক হইতেছে। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীমণ্ডপের কর্ত্তা। মুল্লুক মহাশয়, ধর্‌ধর্‌ মহাশয় ও ফর্‌ফর্‌ মহাশয় খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; চাকরদের খুব ধমক দিতেছেন; মায়া যেখানে আছেন, তাঁহার উপরও খুব তম্বী হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা ও উৎকল প্রভৃতি নানা দেশের কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিতেরা বসিয়া আছেন ও কি পদ্ধতিতে পোষ্যপুত্র লওয়া হয়, তাহাই দেখিতেছেন। এক জন দক্ষিণরাঢ়ী পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রী কর্তৃক ক্রিয়ায় আভ্যুদয়িকের নিয়ম নাই; এক্ষণে আভ্যুদয়িক কেন হইতেছে?" তখন উভয় পক্ষের পণ্ডিতের মধ্যে খুব বিচার বাধিয়া উঠিল। এক জন বলিয়া উঠিল—'স্ত্রীর প্রেত-শ্রাদ্ধেই অধিকার আছে; আভ্যুদয়িকে তাহার আবার অধিকার কি?' আর একজন বলিলেন—"যদিই করিতে হয়, প্রতিনিধির দ্বারা করিতে হইবে।" এক জন বলিলেন—"পুরোহিত প্রতিনিধি হইবেন।" আর এক জন বলিয়া উঠিলেন—"সে কি? বেণের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ? এক জন ধনীবংশেরই প্রতিনিধি হইবেন।" ক্রমে বিবাদ এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, মস্করী মহাশয় সমস্ত ব্যাপারটা ভবদেব ভট্টের নিকট বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এখনও বঙ্গভূমির জন্য পদ্ধতি লেখা হয় নাই। শূদ্র-পদ্ধতির ত কথাই নাই। সে যে কবে লেখা হইবে, তাহারও ঠিক নাই। আমি যখন ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, পদ্ধতিও লিখিয়া দিব। কিন্তু রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পারিয়া উঠি নাই, সুতরাং সাতশতীরা আবহমান যাহা করিতেছে, তাহাই করুক; তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।"

৩

আভ্যুদয়িক আরম্ভ হইয়া গেল। সাতশতীদের আভ্যুদয়িক নূতন রকমের। তাঁহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় সর্ব্বপ্রথমে যে ভোজ্য উৎসর্গ হয়, তাহা হইল না, ও তাহার দক্ষিণান্তও হইল না, তাহার পর যে ৪টি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়, গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বাস্তুপুরুষ ও ভূস্বামীর পিতৃগণের নামে, সে ৪টি ভোজ্য উৎসর্গ হইল না। মায়া দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন, আচমন করিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে ২টি হস্ত-কুশ দিলেন। বলিলেন, "অনামিকা অঙ্গুলিতে পর।" সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডীরা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "একে স্ত্রীলোক, তাহাতে শূদ্র, কুশে উহার অধিকার কি? দূর্ব্বা দিয়া উহার হস্ত-কুশ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" অনেক গোলমালের পর কুশই রহিয়া গেল। সঙ্কল্পের পর ৭খানি পাত্র সাজান হইল, যত কিছু উৎকৃষ্ট খাবার পাত্রে রাখা হইল। সাত জন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ

সকলেই পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্—সাত পাত্রে বসিয়া গেলেন। দেবপক্ষের ২জন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিলেন; পিতৃপক্ষের ৩ জন উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন; আর মাতামহপক্ষের তিন জন সেই সারেই বসিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভিতর গোল বাধিয়া গেল। অনেকে বলিলেন, "কলিতে পংক্তিভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ মিলে না। সে জন্য দর্ভময় ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা প্রথা হইয়া গিয়াছে। সারা বাঙ্গলা, মিথিলা, সরযূপার, নেপাল, উড়িষ্যা সব জায়গায়ই দর্ভময় ব্রাহ্মণ দিয়া শ্রাদ্ধের ব্যাপার চলিয়া গিয়াছে। এখানে এ আবার কি?" তখন বিধুভূষণ ফর্ফর্ বলিয়া উঠিলেন,—"প্রতি হাতে এরূপ আপত্তি করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে যে? আমার নব্বই বৎসর বয়স হইতে চলিল, বরাবর শূদ্রদের যে ভাবে কার্য্য করাইয়া আসিয়াছি, এখনও সেই ভাবেই করাইব। তাহাতে ত্রুটী হয়, ধর, ঘাড় পাতিয়া লইব। অন্য দেশে কি আছে না আছে, তাহা দেখিবার দরকার নাই। আমরা সাক্ষাৎ সুগড়াচার্য্যের শিষ্য, তিনিই বেদের প্রথম টীকা লেখেন। তিনিই আমাদের দেশে আগাগোড়া বেদ মুখস্থ করা বন্ধ করিয়া দিয়া যান। যে জাতির যেরূপে ক্রিয়া করিতে হইবে, তিনিই আমাদের শিখাইয়া যান।" সুগড়াচার্য্যের নামে ও ফর্ফরের রাগে অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডীরা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

এই যে সাত জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন, ইঁহাদের নাম পংক্তি, পংক্তি এক জনে হয়, তিন জনে হয়, পাঁচ জনে হয় ও সাত জনে হয়। সাত জনের অধিক ব্রাহ্মণ দরকার হয় না। শ্রাদ্ধেই পংক্তির দরকার হয়; অন্য কিছুতে দরকার হয় না; বাছিয়া বাছিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া পংক্তিতে বসাইতে হয়। কাণা, খোঁড়া, কুরূপ, কুৎসিত, ধবলওয়ালা, কুষ্ঠওয়ালা, কুনখী, কুদন্তী পংক্তিতে লইতে নাই। পংক্তির ব্রাহ্মণ বড় বাছিয়া লইতে হয় বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণ চলিতেছে। কিন্তু দক্ষিণে এখনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, সেজন্য তাহারা পংক্তি হয়, ও ব্রাহ্মণ পংক্তিতে বসে। মায়া পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন, তাহাদের সৌগন্ধ্যবিধানের জন্য প্রচুর ধূপ-ধুনা পোড়াইলেন এবং গন্ধদ্রব্য তাঁহাদের উপর বৃষ্টি করিলেন। এইরূপ পূজায় যখন তাঁহাদের মন অমল প্রফুল্ল হইল, তখন মায়া তাঁহাদের হস্তে এক একটি ফল তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা সে ফল খাইলেন ও পরে পাত্র হইতে অনেক ফল-মূল ও মিষ্টান্ন লইয়া ভোজন করিলেন। ভোজনে তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা পাত্র ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ভোজনের স্থান পরিষ্কার করা হইল। মায়া সেখানে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেন, ও দক্ষিণান্ত করিলেন। পংক্তির ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইলেন ও বলিলেন,—"আমরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমাদের জাত-ভাই আমাদের সঙ্গে খাইবে না, সেজন্য আমাদের কিছু পয়সা দাও। সেজন্য তাহাদিগকে কিছু পয়সা দেওয়া হইল ও তাঁহারাও তাহা যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৪

ওদিকে যে সকল ব্রাহ্মণেরা হোমের স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মায়ার এক হাত চৌকা ঐ জমী মাপিয়া লইয়া তাহার উপর কয়েক সরা বালি ছড়াইয়া দিলেন, সেই বালির উপর এ দিকে দেড় আঙুল ওদিকে দেড় আঙুল বাদ দিয়া একটি ২১ আঙুল রেখা টানা হইল। ব্রাহ্মণেরা যে দিকে বসিয়াছিলেন,সেই দিকেই রেখা টানা হইল। সেই রেখার ডাইন ধার হইতে পূর্ব্বমুখে একটি রেখা ৭ আঙুল পর্য্যন্ত টানা হইল। তাহার পর মূল রেখার ৭ আঙুল বাদ দিয়া আর একটি রেখা টানা হইল, আর ৭ আঙুল বাদ দিয়া আর একটি রেখা টানা হইল। যে অস্ত্র দ্বারা রেখা টানা হইল, তাহার নাম স্ফ্য। স্ফ্যখানি কাঠের তয়েরী—ছোরার মত। বাঁট আছে, আগাটি সরু, সাম্‌নের দিক্ ধার, পিছনের দিক্ মোটা। আগাটি ঠিক মাঝে না হইয়া একটু পিছনের দিক্ আছে। পূর্ব্বাস্য রেখাগুলি টানিতে যে বালিগুলি উঠিল, বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা সেগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর বহ্নিস্থাপন। ৩টি রেখা টানায় ২টি ঘর হইয়াছে ও বামদিকের ঘরে কাঁসার পাত্রে করিয়া বহ্নি আনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল।

বহ্নি কোথা হইতে আনিবে? এক যারা যে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে ও সেই অগ্নি বরাবর রাখে, তাহাদের বাড়ী হইতে অগ্নি আনা যাইতে পারে অথবা মন্থন করিয়া অগ্নি আনা যাইতে পারে। মায়া স্থির করিল, মন্থন করিয়া অগ্নি বাহির করিতে হইবে।

সে একখানি শুকনো অশ্বত্থকাঠ আনাইয়া তাহার মাঝে একটি গোল ছেঁদা করাইল। সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া একটি শাঁইবাবলার একটি মোটা গোল ছেঁদা কাঠ সেই অশ্বথের সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া একটি শাঁইবাবলার একটি মোটা গোল কেঁদোকাঠ সেই অশ্বথের সেই ছেদাঁয় বসাইয়া দিল। (বাঙ্গলায় শমীবৃক্ষ নাই, সেজন্য শাঁইবাবলার গাছে শমীবৃক্ষের কার্য্য করে)। ব্রাহ্মণেরা সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই শাঁইবাবলার কাঠ ঘুরাইতে লাগিলেন। অগ্নি সমিদ্ধানে ব্যবহার হয় বলিয়া এই মন্ত্রগুলির নাম হইয়াছে সামি-ধেনী। ক্রমে যখন ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেশ একটু সহজ হইয়া আসিল, তখন দুই পাশে দুই দল ব্রাহ্মণ বসিয়া দড়ী দিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে সামিধেনী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কাঠগুলি ক্রমে খুব গরম হইয়া উঠিল। তাহার পর ধূম বাহির হইল, তাহার পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির একখানি আঙরা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাকীটা কাঁসার পাত্রে করিয়া বালির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল। তখন যিনি আগুনের কাছে বসিয়া, তিনি মহাব্যাহৃতিহোম করিলেন অর্থাৎ গাওয়া ঘিয়ে চামচের আকার কাঠের স্রুক ডুবাইয়া অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিলেন—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৫

পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ লইয়া, বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া, এইবার পোষ্যপুত্র লওয়া হইবে।

হোমের স্থান ও আভ্যুদয়িকের স্থানের মাঝখানে খুব জাঁকাল বিছানা করা হইয়াছে—মখমলের বিছানা, জরীর কাজ; উপরে চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার ঝালরে মুক্তা ঝুলিতেছে। মধ্যে বসিয়া আছেন মায়া, সাধন ধনী—যিনি পুত্র দিবেন,তাঁহার স্ত্রী ও রাজা বিহারী দত্ত। বহ্নিস্থাপন করিয়া এবার ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "এবার পোষ্য-পুত্রগ্রহণের অনুমতি লও।" তখন বিহারী ও মস্করী মায়াকে সঙ্গে করিয়া প্রথমতঃ রাজসিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা আসেন নাই, তাঁহার ভায়ের পৌত্র শ্যামল বর্ম্মা আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলে, তিনি যে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণসিংহাসনে মহারাজাধিরাজের যে তরবারি ছিল, তাহা মায়ার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বড় ঠাকুরদাদার নাম উচ্চারণ করিয়া অনুমতি দিলেন। মায়া উঁহাকে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, একটি দশমনি সিধা তাঁহার বজ্‌রায় পঁহুছে। তাহার পর ভবদেব; তিনিও অনুমতি দিয়া কয়েকখানা স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন এবং একটি বড় সিধা পাইলেন। তার পর প্রধান সেনাপতি। তিনিও একটি সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা পাইলেন। শ্যামল বর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমারোহ-কার্য্যের অধ্যক্ষ কে?" অধ্যক্ষ ত ভবদেব শর্ম্মা নিজে। কিন্তু বিহারীর বাকাস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই ভবদেব বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্যে ভবতারণ পিশাচখণ্ডী ইহার অধ্যক্ষ।" তখন শ্যামল বর্ম্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাথায় এক শালের ফেটা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর মস্করী ও মায়া এক দিকে অনুমতি লইতে গেলেন, আর এক দিকে গেলেন রাজা বিহারী দত্ত নিজে। আর দুই দিকে অনুমতি লইতে গেলেন দত্তবাড়ীর প্রাচীনেরা ও ধনীবাড়ীর প্রাচীনেরা। মস্করী মায়াকে লইয়া রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া, যেখানে বৌদ্ধেরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ গুরুপুত্র। মায়া তাঁহার অনুমতি লইতে আসিতেছেন, সঙ্গে মস্করী, দেখিয়াই গুরুপুত্র থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া গেল। মায়ার কিন্তু গলা একবারও কাঁপিল না। সে বলিল, "আচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাস্থবির, ভদন্ত, আমি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব, আপনারা প্রসন্ন-মনে অনুমতি করুন।" গুরুপুত্র মনে মনে বলিলেন, "কি শীকারই পলাইল!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমতি আছে। সাতগাঁয়ে একটি প্রধান ধনিবংশ রক্ষা হইয়া যাইবে, ইহাতে কে আপত্তি করিবে?" মায়া তাঁহার সম্মানের জন্য সিধা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া গেলেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মঠাধিকারীদেরও সেইরূপ সম্মান করিয়া গেলেন।

যাঁহারা অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া সাধন ধনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনার এই নূতন (পঞ্চম) ছেলেটির আজও চূড়াকরণ হয় নাই। আপনি এইটিকে

আমাকে দিন। আমি ইহাকে পোষ্যপুত্র লইব; ইহার দ্বারা স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে।" সাধন ধনী ছেলেটিকে কোলে করিয়াছিল, সে ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিবার সময় বলিল, "আমি এই ছেলেটিকে তোমায় দিলাম, ইহার দ্বারা তোমার স্বামীর নাম ও গোত্র রক্ষা হইবে। তুমি ইহাকে মায়ের মত প্রতিপালন করিবে।" সাধন ধনী মনে করিয়াছিল, সে বীরের মত পুত্রটিকে দান করিবে, কিন্তু সে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর বদ্‌লাইয়া গেল; সে সভার মধ্যেই কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার মনকে স্থির করিল ও ছেলেটিকে মায়ার কোলে দিল। চারিদিকে বাস্ত বাজিয়া উঠিল। সভাস্থ সকলে সাধু সাধু বলিতে লাগিল; চারিদিকে চারি দেউড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল; ঘোর রোলে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গানে ও বাজনায় আনন্দের ফোয়ারা উঠিতে লাগিল। এ দিকে দশ জন চাকরে ছেলেটিকে সাজাইতে লাগিল;—নানারূপ রেশমের কাপড়ে ও হীরা-জহরতে গরীবের ছেলে এক দণ্ডের মধ্যে বড়মানুষের ছেলে হইয়া উঠিল। মায়া তাহাকে কোলে করিয়া হোমের স্থানে উপস্থিত হইলেন; পুরোহিতেরা তাহাকে হোমের ঘি খাওয়াইয়া দিলেন। মায়াও যে গোত্রের, ছেলেটিও সেই গোত্রের; অতএব গোত্রান্তর করিতে আর কোন বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যক হইল না।

মায়া ছেলে কোলে করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলে, সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল। প্রথমে রাজা আসিলেন; তিনি এক ছড়া মুক্তার মালা দিলেন। তাহার পর ভবদেব আসিলেন; তিনি একখানি কেয়ূর দিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেহ বা শুদ্ধ ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া, কেহ বা কিছু সোনারূপা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। ধনী বেণে ও অন্যান্য জাতিরা বিস্তর উপহার দিল। ধান্য-দূর্ব্বাগুলিতে ছেলেটি চাপা পড়ার মত হইলে সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হীরা-জহরত, সোনারূপা এত জমিল যে, ছেলের চেয়ে উঁচু হইয়া উঠিল। এমন সময়ে যিনি হোম করিতেছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার হোম হইয়াছে, তোমরা ফোঁটা লও।" সকলের আগে ফোঁটা লইলেন ছেলে, হোমের ঘিয়ে হোমের কয়লা ঘষিয়া প্রথম কপালে, পরে কণ্ঠায়, পরে দুই কাঁধে, পরে বুকে ফোঁটা লওয়া হইল। তাহার পর লইলেন মা; তার পর লইলেন বিহারী দত্ত। তাহার পর যে আসিল, পুরোহিতেরা তাহাকেই ফোঁটা দিতে লাগিল।

ইহার পর শান্তিজলের ব্যবস্থা। কিন্তু অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আমরা এখনও ছেলে আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিতে পারি নাই।" সুতরাং শান্তিজল স্থগিত রহিল। যে সকল লোক আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধরাই বেশী—প্রত্যেক মঠধারী আপন আপন মঠের পুষ্প-চন্দন আনিয়াছিলেন ও ছেলেকে কিছু-না কিছু মহামূল্য উপহার দিলেন। গুরুপুত্র হেরুকের প্রসাদী এক ছড়া মালা দিলেন আর একটি হীরার মাছ দিলেন। যে আটটি মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে মাছই সকলের আগে। গুরুপুত্রের মাছটির দুই চোখে দুইটি হীরা নানা রকম পাথরে এমন ভাবে গড়া যে, মাছটি যেন

নড়িতেছে। তিনি মাছটি একটি সোনার হারে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন,ছেলের গলায় পরাইতে গিয়া তাঁহার দুইটি আঙুল মায়ার গায়ে লাগিল; সহসা যেন গুরুপুত্রের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। গুরুপুত্র যেন হঠাৎ হতচেতন হইয়া গেলেন। কিন্তু অল্পেই আত্মসংবরণ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। বৌদ্ধস্পর্শে মায়া যদিও একটু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার মনে হইল যে, তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, মহাবিহারের অধিকারী, লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানে, তখন তাহার আর সে বিরক্তি রহিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার তাহার অবসর ছিল না; থাকিলেও তিনি সে কথাটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিতেন না। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলে শান্তিজল। সভা শুদ্ধ লোক পা ঢাকিয়া বসিল। বিধুভূষণ ফরফর্ মহাশয় নারিকেলটি সরাইয়া দিয়া আম্রপল্লব জলে ডুবাইয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন ও মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার হাত এমন দুরন্ত ছিল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে সভার সমস্ত লোকের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন এবং সকলেই শান্তি শান্তি শান্তি হরি হরি বলিয়া উঠিল।

৬

তাহার পর ভোজনের পালা। গোলার দোতালার বারান্দায় ব্রাহ্মণদের পাত হইয়াছে। প্রায় ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের জায়গা হইয়াছে। সাতশতীরা ফলার করিবেন, অর্থাৎ লুচি, ছক্কা, মিষ্টান্ন খাইবেন। রাঢ়ীশ্রেণীরা কেহ কেহ খৈ ও দৈয়ের ফলার করিবেন, কেহ বা শুদ্ধ ফল ও সন্দেশ খাইবেন। অনেকেই শূদ্রের বাড়ী জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। পাত প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় গোল উঠিল, ধনীদের গোলা গঙ্গার তিন শত হস্তের মধ্যে, উহা গঙ্গাতীর। এখানে খাওয়াও হইতে পারে না, দান লওয়াও হইতে পারে না। ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীর দিন যত দূর জল উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ; তাহার পর তিন শত হাত গঙ্গার তীর। তাহার পর গঙ্গার ক্ষেত্র। গর্ভ ও তীরে কাহারও ভোজন করিতে নাই, দানও লইতে নাই। তবে যে মায়া ব্রাহ্মণগণকে সিধা ও স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, সেটা অনুমতি দেওয়ার সম্মান। 'অদৃষ্টার্থ ত্যক্ত দ্রব্য নহে,' সুতরাং দান নহে। গোলায় ত কিছুতেই খাওয়া হইতে পারে না। গোল উঠিলেই রাজা বিহারী গোলা হইতে একটু পশ্চিমে পালধি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নাটচালা ছিল, সেইখানে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার লোকবলের অভাব ছিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে ৪।৫ শত ব্রাহ্মণের স্থান প্রস্তুত হইল, পরিবেশনও হইয়া গেল। অনেক ব্রাহ্মণ—যাঁহারা শূদ্রান্নং শূদ্রবেশ্মনি খাইতে রাজী ছিলেন, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উদ্যোগ হওয়ায় তাঁহারাও বসিয়া গেলেন।

গোলার বারান্দায় অন্যান্য জাতি বসিল। ইহারা, বিহারীর কাজ যে সবই ভাল হইবে, তাহা বেশ জানিত, তাই একটি কথাও কহিল না। তিনি যেমন যেমন বলিলেন, ঠিক

তেমনি তেমনি করিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা একটা প্রবল সম্প্রদায়। তাহাতে অনেক জাতি, অনেক ব্যবসায়ী, অনেক গৃহস্থ, অনেক অর্দ্ধ-গৃহস্থ, অনেক পুরা গৃহস্থ। বৌদ্ধদের বিকালভোজন নিষেধ। বিকাল শব্দের অর্থ দ্বিকাল। তাহারা দিনে দুবার খাইবে না। সকালে ১২টার মধ্যেই খাইবে। না খাইলে সমস্ত দিন কেবল ফলরস বা দুধ খাইয়া থাকিবে। কোনও কঠিন জিনিস খাইতে পারিবে না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আর বিকাল-ভোজন নিষেধ মানে না। দুই বেলা খায়। অসময়েও খায়। দু'চার জন বিকালভোজন করে না। তাহাদের মধ্যে প্রায় মঠের অধ্যক্ষেরা। আমাদের গুরুপুত্র বিকালভোজন করেন না। কিন্তু মায়া তাঁহারই উপর সমস্ত বৌদ্ধদের খাওয়াইবার ভার দিয়া দিলেন। গুরুপুত্রও কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। রাজার ভাণ্ডার, ফুরাইবার নহে। সকলেই পরম তৃপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া গেল। তখন মস্করী ও মায়া গুরুপুত্রকে ধরিয়া বসিল, আপনাকে কিছু ফলরস পান করিতে হইবে। যে কয় মঠাধিকারী ভোজন করেন নাই, মায়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে আনারস, তরমুজ, ফলসার সরবৎ, দুধ, ঘোল প্রচুরপরিমাণে পান করাইয়া দিলেন। তাঁহারাও তৃপ্ত হইয়া গেলেন।

যত লোক আসিয়াছিলেন, সকলেই বেশ তৃপ্ত হইয়া গেলেন। কেবল দুজনের মুখখানি ভার। একজন সাধন ধনী। পাঁচটি ছেলে থাকিলেও একটি ত আজ থেকে তাঁহার পর হইয়া গেল। তাঁহার মনটা ঠিক প্রফুল্ল নয়। আর গুরুপুত্র আজকার যা দেখিলেন, সবই অদ্ভুত। এমন মেয়ে ত তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একদিকে বজ্রাদপি কঠোর, আবার আর একদিকে কত নরম—যেন মাটীর মানুষ। তাঁহার মনের কথা সব জানি না। তবে তিনি বড়ই বিচলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাহিত্যিকের অদৃষ্ট

১

সে তখনও তেমনই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু একটু কৌতূহলও হইল। বলিলাম, "এখন কি করিবে? এত দিনের চাকরীটা গেল, সংসার চালাইবে কিরূপে?"

তেমনই মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "পরিশ্রম করিবার ভার আমার উপর। পরিশ্রম করিয়া যাইব। চলা না চলা, সেটা ত আমার উপর নাই, ভাই! আর তোমরা পাঁচজন ত আছ?"

এমনই নির্ব্বিকারভাবে, এমনই দৃঢ় বিশ্বাসভরে সে কথাটা বলিল যে, আমিও বিচলিত না হইয়া পারিলাম না।

বাল্য হইতে যৌবন পর্য্যন্ত একসঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম। সেই শৈশব হইতে যৌবনের মধ্যাবস্থা পর্য্যন্ত দেখিলাম, সে একই ভাবে আছে। ক্লাশের মধ্যে তাহার মত নিরীহ, নির্ব্বিরোধ ছাত্র কেহ ছিল না। পড়াশুনায় তাহার খুবই মন ছিল, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে কোনও দিন আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। মনে আছে, একবার ক্লাশের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়াছিলেন। সর্ত্ত ছিল, প্রবন্ধের নীচে আমরা কেহই নাম স্বাক্ষর করিব না। পণ্ডিত মহাশয় নম্বর দিবার সময় তাহা হইলে পক্ষপাত করিতে পারিবেন না। সকলেই সর্ত্তানুসারে নাম দেয় নাই। পরীক্ষা শেষ হইলে পণ্ডিত মহাশয় একদিন খাতাগুলি আনিয়া নম্বর বলিয়া গেলেন; কিন্তু কে কত পাইয়াছে, তাহা স্থির হইল না। সেবার আমরা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একখানি খাতা লইয়া সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই প্রশ্ন-পত্রের উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি ইহাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়াছি। এ খাতা কাহার?"

আমাদের মধ্যে সকলেই উঠিয়া গিয়া খাতাখানি দেখিয়া আসিলাম। শুধু কিরণচন্দ্র

উঠিল না। হাতের লেখা দেখিয়া আমরা বুঝিলাম, উহা কিরণের প্রবন্ধ। কিন্তু সে এমনই নিশ্চিন্ত যে, নিজের প্রশংসা শুনিয়াও বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না। পণ্ডিত মহাশয় জানিতে পারিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া যখন অজস্র প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাহার আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিজয়গর্ব্ব অথবা উল্লাসের কোনও লক্ষণ-তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই। সে দৃশ্য আজিও আমার বেশ মনে আছে। আরও মনে আছে, তাহারি প্রতিশ্রুতিপালনের আগ্রহ। কোনও বিষয়ে কথা দিয়া কিরণচন্দ্র কখনও কথার খেলাপ করিয়াছে, এ কথা মনে পড়ে না। নিজের শত অসুবিধা সত্বেও সর্ব্বদাই তাহাকে কথামত কাজ করিতে দেখিয়াছি।

মনে আছে, পাঠ্যাবস্থায় একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার একখানি বই লইয়া যাইবার কথা ছিল। সে দিন রবিবার। শ্রাবণের আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অপরাহ্ণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের প্রকোপও ছিল। পাড়ার কয়েকজন মিলিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আমরা তাস-খেলায় মত্ত ছিলাম। কিরণের যে বই লইয়া বৈকালে আসিবার কথা ছিল, সেই দুর্য্যোগে তাহা আমার মনেও ছিল না। বিশেষতঃ চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমি খেয়ালবশে সে কথা বলিয়াছিলাম। তার পর নিজেই সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আমাদের তাসের আড্ডা ঘোর বর্ষায় বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আর্দ্র-বস্ত্রে সহসা কিরণচন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার জুতা, কাপড়, জামা বহিয়া জল ঝরিতেছিল। ছাতির দুই তিনটা শিক ঝড়ের বেগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য তাহার এই আগ্রহ সে দিন আমার মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই দিন হইতে এ বিষয়ে আমি তাহাকে মনে মনে গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিলাম। জীবনের বর্ত্তমান সফলতা তাহারই প্রতিশ্রুতি-পালনের আদর্শে লাভ করিতে পাইয়াছি, সে কথা অস্বীকার করিব না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া গেলে কিরণের সহিত দীর্ঘ দশ বৎসর আমার দেখা হয় নাই। কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া আমাকে দূর-প্রবাসে যাইতে হইয়াছিল। ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর যখন কিরণের সহিত প্রথম দেখা হইল, তখন সে কোনও সওদাগরী আপিসে কেরাণীগিরী করিতেছে। তিনটি কন্যা ও তিনটি পুত্র তাহার অভাবপিষ্ট সংসারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কিরণের মুখের প্রসন্ন হাসিটি তেমনই আছে। দারিদ্র্য অথবা অভাব তাহার প্রসন্নতার গর্ব্বকে কিছুমাত্র খর্ব্ব করিতে পারে নাই।

আমাদের পৈতৃক ব্যবসায় ছিল গ্রন্থপ্রচার। পিতার মৃত্যুর পর আমি দেশে ফিরিয়া সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। অনেক প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ

সাহিত্যসেবীর গ্রন্থের প্রকাশক আমরাই ছিলাম। কোনও কারণে অভিমানবশতঃ পিতার উপর রাগ করিয়া আমি অন্যত্র কাজ করিতে গিয়াছিলাম। স্নেহময় পিতা আমাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনেকবার আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মস্থলে পরিণামে এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম এবং ভাগ্যলক্ষ্মী দুই হস্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন বলিয়া শেষে বাবাও সে কার্য্য পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই।

কেরাণীগিরীর সঙ্গে সঙ্গে কিরণ সাহিত্যচর্চ্চা করিত। উপন্যাস-লেখক বলিয়া তাহার প্রতিপত্তিও হইয়াছিল। সারাদিন গুরুতর পরিশ্রমের পরও সে যে কেমন করিয়া বাণীর সেবা করিত এবং তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমারও অগোচর ছিল। কিন্তু নানা মাসিক পত্রে প্রায়ই তাহার রচনা দেখিতে পাই-তাম। বাবাও দেখিয়াছি তাহার কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশক হইয়াছিলেন। অভাবে পড়িয়া গ্রন্থের স্বত্ব সে আমাদের কাছেই বিক্রয় করিয়াছিল। আমার আমলেও আমি তাহার কয়েকখানি বই ছাপাইয়াছিলাম।

আমি বলিলাম,"যদি চাকরী আর না জোটে, তবে বই লিখিতে থাক। আমি পূর্ব্ববৎ তোমার বইগুলি ছাপিব। তাহাতে তোমার কিছু আয় হইবে।"

অবশ্য, তাহাকে সাহায্য করার স্পৃহা আমার যে কিছু না ছিল, তাহা নহে। তবে ব্যবসায়ের দিক্ দিয়াও কথাটা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম।

কিরণ প্রসন্ন হাস্যে বলিল,"তাই ত বলিতেছিলাম, তোমরা পাঁচজন যখন আছ, তখন ভাবনা কিসের?"

আমি বলিলাম, "ভাল ভাল বিদেশী উপন্যাসও তর্জ্জমা করিয়া ফেলিতে পারিলে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু আয় হইবে। সব সময় ত আর মৌলিক উপন্যাস লেখা ঘটিয়া উঠিবে না।"

"সে ত ঠিক কথা। আচ্ছা ভাই, আমি তোমার কথায় রাজি আছি। এখন তোমরাই আমার ভরসা।"

তাহার চাকরী যাইবার একটা ইতিহাস ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে কিরণ পুত্রের সেবার জন্য তিন মাস ছুটী লইয়াছিল। অনেক কষ্টে পুত্র সারিয়া উঠিল, কিন্তু কিরণ কার্য্যচ্যুত হইল। নূতন সাহেব তাহাকে রাখিতে চাহে নাই। ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া আপিসে কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিরণ তাহাদেরই দলে পড়িয়াছিল।

২

ব্যবসায়ে আমার লাভ দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ঐকে নূতন উত্তম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে

প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার উপর পিতার ও আমার সঞ্চিত অর্থ এবং বাজারে সুনাম এই কয়টির সহায়তায় গ্রন্থ-প্রকাশের কার্য্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। বহু নূতন গ্রন্থকারও আমাদের পুস্তকালয়ে গ্রন্থ দিতে লাগিলেন। দেখিলাম, এই দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে, চির-দরিদ্র সাহিত্যিকগণকে অতি অল্প মূল্যেই কিনিতে পারা যায়। অর্থাৎ তাঁহাদের বহুদিনের পরিশ্রম ও সাধনলব্ধ রত্নরাজির মালিকান্ স্বত্ব সামান্য অর্থের বিনিময়েই আপনার করিয়া লওয়া যায়। পিতার অন্তিম উপদেশবাণী সর্ব্বক্ষণই মনে জাগরূক ছিল, সুতরাং গ্রন্থ-স্বত্ব ক্রয় করিবার দিকেই বিশেষভাবে মন দিয়াছিলাম।

ব্যবসায়ে কি করিয়া সাফল্যলাভ করিতে হয়, তাহা আমার জানাই ছিল। সাহিত্যিকগণকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নহে, ইহা আমি বেশ জানিতাম। অর্থাৎ শিষ্ট ব্যবহার এবং তাঁহাদের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝাইয়া দেওয়া এই দুইটি বিষয়ে আমার ক্রটী কখনও হইত না। অভাবগ্রস্ত প্রতিভাশালী গ্রন্থকারগণ উদরান্নের জন্য সামান্য অর্থেই তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের স্বত্ব বেচিয়া যাইতেন, সেটা তাঁহাদের মহৎ দুঃখ, অনুভূতির দ্বারা তাহা যে একবারে না বুঝিতাম, তাহা নহে। কিন্তু আমি ত দানচ্ছত্র খুলি নাই, ব্যবসা করিতেই বসিয়াছি। কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশ করিবার সুবিধা ছিল না।

কিরণচন্দ্রের অনেক গ্রন্থই এইরূপে আমার হস্তে আসিয়াছিল। এক একখানি গ্রন্থের বিনিময়ে আমি তাহাকে যাহা দিতাম, সে হাস্যমুখে তাহাই গ্রহণ করিত। কোনও দিন তাহাকে প্রতিবাদ করিতে শুনি নাই। পঞ্চাশ হইতে এক শত টাকার মধ্যে তাহার রচিত এক একখানি গ্রন্থের স্বত্ব কিনিয়া লইতাম। কিরণের রচনায় মাধুর্য্য ও আন্তরিকতা ছিল। সুতরাং তাহার গ্রন্থের পাঠকসংখ্যা কম ছিল না। তাহার রচিত যে কোনও গ্রন্থই হউক না কেন, প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই সকল খণ্ড বিক্রয় হইয়া যাইত।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর তাহাদের ও দিকে যাইবার অবকাশ ইদানীং আমার বড় একটা ঘটিত না। কার্য্যের ক্ষেত্র যেমন প্রশস্ত হইতেছিল, অবকাশও তেমনই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল। আহার এবং নিদ্রার পর্য্যাপ্ত সময় পর্য্যন্ত ছিল না। কর্ম্মের প্রচণ্ড নেশা আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। কিরণ মাঝে মাঝে আসিত—বই দিতে এবং টাকা লইতে। অবকাশের এতই অভাব হইয়া পড়িয়াছিল যে, দু'দণ্ড তাহার সহিত বসিয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করিব, সে সময়ও প্রায় হইত না। দুই চারি কথায় পরস্পরের বাড়ীর সংবাদমাত্র জানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য প্রসঙ্গের আলোচনার সুবিধা হইত না।

অর্থের ধ্যানে যাহারা মত্ত, সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সকলেরই বোধ হয় এইরূপ

অবকাশের অভাব ঘটে। এক এক সময় এজন্য যে মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করিতাম, তাহা নহে, কিন্তু সে অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। অর্থের মোহিনী মায়া দিন দিন আমাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর টাকা-আনা-পাইয়ের যুগে এজন্য সম্ভবতঃ কেহ আমায় অপরাধী বলিয়া মনে করিবেন না।

৩

কিরণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পর বৌভাতের নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম। কিরণ আমাকে পাইয়া যেরূপ অকপট আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিল, তাহাতে আমার কর্ম্মমত্ত হৃদয়ের এক প্রান্ত যেন স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত হইয়া গেল। সে যে আমাকে ভালবাসে, তাহা আমি যে না জানিতাম, তাহা নহে; কিন্তু আমার জন্য যে প্রকৃতই সে তাহার হৃদয়ে এতখানি স্থান রাখিয়া দিয়াছে, তাহা জানিতাম না।

কিন্তু কিরণের বিষয়বুদ্ধির অভাব দেখিয়া আমি তাহাকে একটু তিরস্কার করিলাম। তাহার বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা, এ অবস্থায় ভ্রাতার বিবাহে কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ না করিয়া যে সে অবিবেচনার কাজ করিয়াছে, তাহা আমি স্পষ্টই তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম।

কিরণ তেমনই স্নিগ্ধ-শান্ত হাস্যে বলিল, "কি করিব বল ভাই! টাকা লওয়ার বিরুদ্ধে চিরকাল মত প্রকাশ করিয়া আসিয়া আজ নিজেই সে পথটা দেখান কি সঙ্গত?"

আমি উত্তেজিতভাবে বলিলাম, "কেন সঙ্গত নয়? মেয়ের বাপ যখন হাইকোর্টের একজন বড় উকীল, যথেষ্ট অর্থও তাঁহার আছে, তখন টাকা কেন লইবে না? গরীব হইলে সে কথা বরং বিবেচনার বিষয় ছিল। বিশেষতঃ এখনই তোমার নিজের মেয়ের বিবাহে তুমি বিনা পণে পার পাইবে না।"

ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "মেয়ের বাবা আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি পণপ্রথার বিরোধী। যদি আমি আজ টাকা চাই, তিনি অগত্যা দিতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিরদিনের সংকল্পভঙ্গ হইবে। সুতরাং আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ হইতে পারি নাই। তবে তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, আমার মেয়ের বিবাহের ভার তিনি নিজেই লইবেন, তাহা হইলে আর আমায় বেগ পাইতে হইবে না।"

আমি বলিলাম, "এ বন্দোবস্ত অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু তোমার ভ্রাতার বিবাহে

যে টাকা ধার হইবে, তাহার কি? তোমার ত এমন অবস্থা নয় যে, বেশী খরচপত্র করিতে পার?"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "ভাইটিকে এতদিন কষ্ট করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করাইয়াছি, তাহার বিবাহের ভারটাও নামাইয়া দেওয়া আমার উচিত। তবে খরচ আমি বিশেষ কিছু করিতেছি না। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকটি আত্মীয় ছাড়া কাহাকেও ডাকি নাই। তোমার কাছে সে দিন যে দুইখানি বই দিয়াছি, তাহার টাকাতেই কোন-মতে কাজ সারিব।"

বরাবরই জানিতাম, কিরণের হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহার হৃদয়ে কোনও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। মনে মনে কিরণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সে জীবন-সংগ্রামে অচল অটল হইয়াই আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে বিচলিত হইতে দেখিলাম না।

আমি বলিলাম, "যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে। এখন চল, তোমার ভ্রাতার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসি।"

কিরণ আমার হাত ধরিয়া, যেখানে নিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেল। কিরণের ভ্রাতার শ্বশুর মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। ইন্দিরা তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। অর্থ-বিভব তিনি যথেষ্টই করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাঁহার পসার এবং প্রতিপত্তি অনেকেরই ঈর্ষার কারণ ছিল।

ভদ্রলোকটির ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। কিরণের প্রশংসা তাঁহার মুখে আর ধরে না। সে একজন শক্তিশালী লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক ও দেশের অলঙ্কার। তাহার বাসভবন খুব সাধারণ হইলেও অতি মনোরম, এ স্থানটিকে তিনি 'কবিকুঞ্জ' বলিয়াই উল্লেখ করিলেন। আলোচনার ফলে বুঝিলাম, তিনি সাহিত্যরসিক, বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। ভদ্রলোকটির হৃদয়ও কোমলতাপূর্ণ বলিয়া মনে হইল। কিরণচন্দ্র এই নিদারুণ পণপ্রথার যুগে যে কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ও ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, এ জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পান, ভোজন, আলাপ-আপ্যায়নে প্রীত হইয়া বিদায় হইলাম। কিরণের ভ্রাতার শ্বশুরের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব লইয়াই গৃহে ফিরিলাম।

৪

সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণের জন্য সেবার মথুরা, বৃন্দাবন ও সাবিত্রী তীর্থ প্রভৃতি স্থলে গিয়া-ছিলাম, :সুতরাং অগ্রহায়ণে কিরণের কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই।

সহধর্ম্মিণীর একান্ত অনুরোধেই বাধ্য হইয়া প্রায় দুই মাস কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আমাকে দূরে থাকিতে হইয়াছিল। কিরণের কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকা আমার খুবই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। তাহার পত্র যখন নানা ডাকঘর ঘুরিয়া অবশেষে আমার হস্তগত হইয়াছিল, তখন আমরা কাশীধামে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। কি আগ্রহপূর্ণ ভাষায় সে আমায় তাহার কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল! আমি তাহার একমাত্র বন্ধু, আবাল্যের সহচর, আমি উপস্থিত না থাকিলে সে হৃদয়ে বড় ব্যথাই পাইবে। সে নিজে কলিকাতার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া আমার তীর্থ-ভ্রমণের সংবাদ জানিতে পারে। সেখান হইতে ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে আমাকে পত্র লিখিয়াছিল।

পত্রের তারিখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, পাঁচ দিন পূর্ব্বে তাহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মনে অনুতাপ জন্মিলেও উপায় ছিল না। কাশী হইতে কিছু উপঢৌকন কিনিয়া ডাকযোগে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। নিজের অনুপস্থিতির জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও ভুলি নাই।

তার পর কলিকাতায় ফিরিয়া কর্ম্মানুরোধে কিরণের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহার কন্যার বিবাহে তাহার ভ্রাতার শ্বশুর তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালন করিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলে কিরণ সংক্ষেপেই বলিয়াছে যে, অর্থ তিনিই সরবরাহ করিয়াছিলেন। নহিলে কন্যাদায় হইতে কিরণের উদ্ধারলাভের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার উপর শ্রদ্ধা বাড়িল। কিরণও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, এ জন্য আনন্দও জন্মিল।

কন্যাদায় হইতে আপাততঃ সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে, এ জন্য যে তাহার স্বাভাবিক প্রসন্নতা কিছু বাড়িয়াছিল, তাহা দেখিলাম না। শালগ্রামের 'শোয়া বসা' যেমন সাধারণের বোধগম্য নহে, কিরণের সুখদুঃখও তেমনই। বাস্তবিক এ পর্য্যন্ত দুঃখের বা দুর্ভাবনার একটা ম্লান রেখা তাহার আননে কোনও দিন প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম না। সুখেও অধিক আনন্দ দেখিলাম না, দুঃখেও ম্লান হইতে দেখি নাই। তাহার এই প্রকার দৃঢ় মানসিক স্বাধীনতার কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে আমার মনকে সুখ-দুঃখে উদাসীন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতাম।

৫

চারি পাঁচ বৎসরে কিরণ আরও অনেকগুলি বহি আমাদের জন্য লিখিয়া দিয়াছিল। যতই দিন যাইতেছিল, আমার অর্থ-গৌরব, প্রতিপত্তি ও যশঃ ততই বর্ষার নদীর ন্যায়

স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া কিরণের নামডাকও খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। একদল পাঠক তাহার রচনা-পাঠের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। ইদানীং গ্রন্থরচনা করিয়া এবং মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া সে নিজের আর্থিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ আমি রাখিতে পারি নাই। কিরণ এ সকল বিষয়ে কোনও প্রকার আলোচনা আমার সহিত করিত না। অবকাশ যদি কখনও ঘটিত, পৃথিবীর সকল বিষয়েরই হয় ত আলোচনা হইত; কিন্তু নিজের অবস্থার কথা, বিশেষতঃ অর্থ-বিষয়ে সে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত না।

প্রায় বৎসরাবধি তাহার পত্নী পীড়িতা, সে সংবাদ আমি জানিতাম। দুই একবার সংবাদ লইতেও তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ের বিশেষ কিছু সংবাদ জানিতে পারি নাই। আর সত্য বলিতে কি, জানিবার মত মানসিক অবস্থা কিংবা অবকাশও বড় একটা ঘটিত না।

পূজার অবকাশ উপলক্ষে ছাপাখানা ও পুস্তকালয়গুলির কার্য্য বন্ধ থাকে। সেই সময়ে আমাদেরও নিশ্বাস ফেলিয়া কয়েক দিন বিশ্রামের অবসর ঘটিয়া থাকে। এবার দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া আর সহসা কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা হইল না। শরীরটা বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিল। যখন অর্থ-ব্যয় করিয়া আসাই গিয়াছে, তখন অন্ততঃ মাসখানেক আরও না কাটাইয়া আর ফিরিতেছি না। কার্য্যালয় খুলিলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে কাজ-কর্ম্ম চালাইবার জন্য লিখিয়া দিলাম।

কিরণ এবার আমার ফরমাসমত একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস লিখিতেছিল। তাহাকেও লিখিয়া দিলাম, কার্ত্তিকের শেষে আমি স্বয়ং গিয়া তাহার নিকট হইতে বইখানি লইয়া আসিব। ইতিমধ্যে সে যেন উহা শেষ করিয়া রাখে।

দুর্জ্জয়লিঙ্গের মধুর শীত ও কুয়াসার প্রভাবে শরীর অল্পসময়ের মধ্যেই সুস্থ হইল। দেহে যেন তরুণ যৌবনের প্রফুল্লতা অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রভাতে ও অপরাহ্নে পর্ব্বতের বিচিত্র শোভা দেখিয়া দীর্ঘকালের সঞ্চিত মনের সকল ক্লান্তি ও অবসাদ কোথায় যেন চলিয়া গেল। ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-স্পর্শে যেমন লৌহও অকস্মাৎ স্বর্ণে পরিণত হয়, আমার মনের শুষ্ক নীরস অংশগুলিও সেইরূপ দুর্জ্জয়লিঙ্গের বিচিত্র বাতাস ও আকাশের প্রভাবে সরসতা ও নবীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

মনের স্ফূর্ত্তিতে দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল। আমি যে কোনও প্রসিদ্ধ ছাপাখানার মালিক এবং বিশিষ্ট প্রকাশক, এ কথা তখন মনে ছিল না। প্রকৃতির অনবদ্য সুষমা আমার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অর্থ, মান, যশঃ, প্রতিপত্তি মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক; কিন্তু যে একবার সমুদ্র ও পর্ব্বতের বিচিত্র

শোভার মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, সে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও পার্থিব ধনসম্পত্তির চিন্তার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকে।

দেড়মাস এই ভাবে চলিয়া গেল। আরও কয়েক সপ্তাহ থকিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় গৃহিণীর নিকট হইতে জোর তলব আসিল।

আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই। এবার আর যুক্তি-তর্ক কিছুই চলিবে না। সুতরাং হে দুর্জ্জয়লিঙ্গ, এবারের মত বিদায়!

৬

কিরণকে কিছু না বলিয়াই একেবারে বইখানি আদায় করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে হাজির হইলাম। আমার গলার স্বর শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে আসিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। বাহিরের ঘরখানি একেবারেই শ্রীহীন। কোনও আসবাবপত্র নাই। এই ছোট ঘরটি অতি যত্ন সহকারে সুসজ্জিত ছিল, তাহার পত্নীর স্বহস্ত-অঙ্কিত কত চিত্র, কত কারুশিল্প গৃহের দেওয়ালের নানা স্থানে রক্ষিত ছিল। কিন্তু সে সকল কিছুই নাই। যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে সব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

একখানি পুরাতন ছিন্নপ্রায় মাদুর বিছাইয়া কিরণ বলিল, "ব'স। দার্জ্জিলিঙ্গে কেমন ছিলে ভাই?"

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তাহার মুখের প্রসন্ন হাসিটি কোনও দৈত্য হরণ করিয়া লইতে পারে নাই।

সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া আমি বলিলাম, "ঘরের এ দুর্দ্দশা কেন? জিনিস-পত্র কোথায় গেল?"

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখানে তাহাদের থাকিতে কষ্ট হইতেছিল, তাই তাহারা গৃহান্তরে উপযুক্ত ব্যক্তির আশ্রয় লইয়াছে।"

আমার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, গাঢ়স্বরে বলিলাম, "ঠাট্টা রাখ, কি হইয়াছে, বল?"

তেমনই মধুর হাস্যে সে বলিল, "সে সকল অপ্রীতিকর কাহিনী জানিয়া কি লাভ, ভাই? অকারণ তোমার মনে একটা উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিবার অধিকার আমার নাই। ভাল কথা, বইখানি শেষ করিয়াছি, একটু দাঁড়াও, আমি আনিতেছি।"

কিরণ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে অন্য দ্বার দিয়া তাহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়

পুত্র প্রবেশ করিল। সে আমাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন ও ছিন্নপ্রায়।

অন্তরে অকস্মাৎ একটা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম। কিরণের অসাক্ষাতে তাহার পুত্রের নিকট ব্যাপারটা জানিবার জন্য কথা পাড়িলাম।

বালক বলিল যে, দেনার জন্য বাড়ীর সব জিনিসপত্র নীলাম হইয়া গিয়াছে। তাহার কাকাবাবুর শ্বশুর তাহার সহোদরার বিবাহের সময় এক হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু হাতে দেন নাই। বাড়ীটা বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল। এই বাড়ী তাহার মাতার নামে। চারি বৎসরে সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়াছে। তাহার বাবা সুদ দিতে পারেন নাই; কাজেই নালিশ হইয়াছিল। তাহার কাকাবাবু এখন শ্বশুরালয়ে। ডিগ্রী হইয়া গিয়াছে। বাড়ী বেচিয়া সব দাম উঠে নাই, তাই অস্থাবর মালও নীলাম হইয়াছে। এখন তাহারা অঋণী। তবে ভূমিশয্যায় শয়ন ও মৃৎপাত্রে ভোজন চলিতেছে। তাহাতে দুঃখ নাই, তাহার মাতার পীড়ার জন্যই এখন দুর্ভাবনা। অনেক বলা কহার পর এই মাস পর্য্যন্ত তাঁহারা এই বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন, আজ শেষ দিন। সম্ভবতঃ আজ তাঁহারা দখল লইতে আসিবেন।

আমি বসিয়াছিলাম, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা আমায় অধীর করিয়া তুলিল। এত বড় দুর্ঘটনার কথা কিরণ আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায় নাই।

পিতার পদশব্দ শুনিয়া বালক গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিরণচন্দ্র সহাস্য-আননে নবরচিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে এখনও হাস্যরেখা, এখনও প্রসন্নতার দীপ্তি!

কিয়ৎকাল একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কিরণ, তুমি মানুষ, না আর কিছু?"

সে হাসিয়া বলিল, "মানুষ ত নিশ্চয়ই নই—জানোয়ার বলিতে পার।"

"তোমার ভ্রাতার শ্বশুর শেষে তোমার যথাসর্ব্বস্ব নীলাম করাইয়া লইল? তুমি এক পয়সাও না লইয়া ভাইয়ের বিয়ে দিলে, আর সেই কপট, ভণ্ড তপস্বী অনায়াসে তোমার সহিত এমন ব্যবহার করিল? তুমি নীরবে সহ্য করিলে?—একবার আমাকেও খবর দিলে না?"

আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "গুরুজন, পিতার মতন। তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করিয়াছেন। আজকালকার দিনে টাকার মায়া কে ছাড়িয়া দেয় বল ভাই? আমি ত তাঁহার কোন অপরাধ দেখি না। আর তুমি—

দার্জ্জিলিঙ্গে তুমি বিশ্রাম করিতে গিয়াছ,' তোমায় জানাইয়া তোমার শান্তিভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় নাই।"

আমি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু সহসা মনে হইল, সত্যই ত আমি যাঁহার ব্যবহারে দোষারোপ করিতেছি. তাঁহার মত ব্যবহার কি আমি নিজেই করি নাই? আমিও কি প্রকারান্তরে এই স্বল্পে সন্তুষ্ট বাল্যবন্ধুর প্রতি অবিচার করি নাই? আমি কি আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় আমি কয়েক পদ সরিয়া গেলাম।

জুতার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, কেহ আসিতেছে। পর-মুহূর্ত্তে তিন চারিটি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, তন্মধ্যে হাইকোর্টের উকীল মহাশয়—কিরণের ভ্রাতার শ্বশুর সাহিত্যরসিক মহোদয়ও আছেন।

কিরণ সমাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিল। ছিন্নপ্রায় মাদুরের উপর তাঁহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিল।

ঘাড় নাড়িয়া উকীল মহোদয় বলিলেন, "বাবাজি, আজ ত তোমাদিগকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইতেছে। আমার মিস্ত্রীরা কা'ল হইতে কাজে লাগিবে। আর ত ফেলিয়া রাখিতে পারি না।"

কিরণ বলিল, "যে আজ্ঞা, আমি আজ অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "নমস্কার, আমায় চিনিতে পারেন?"

তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া পরে বলিলেন, "ওঃ! আপনি রমেশ বাবু নন?"

আমি বলিলাম, "যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। একটা কথা আছে, মাপ করিবেন,—'কবি-কুঞ্জ' মেরামত করিবার কাজটা কিছু দিন বন্ধ রাখা যায় না কি?"

বুঝিলাম, আমার বিদ্রূপ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "জিনিসটা শুধু পড়িয়া আছে, অনেকগুলি টাকা দিতে হইয়াছে। আজকালকার বাজার কেমন, তাহা ত জানেন।"

আমি বলিলাম, "সবই জানি মহাশয়, এটা যে ঘোর কলি, তাহাও জানি। কত টাকা আপনার পাওনা, বলুন ত?"

"সুদে আসলে সাড়ে তিন হাজার টাকা হইয়াছিল। এতগুলি টাকা আজ এক-মাস বন্ধ হইয়া আছে।"

আমি একটু তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, "তা সত্য, অতি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছেন!

এই সাড়ে তিন হাজার টাকা কিরণ ফেলিয়া দিলে আপনি উহাকে বাড়ী ফিরাইয়া দিতে পারেন ?"

"তা কেন পারিব না ? কিরণ ত আমার ঘরের ছেলের মত। টাকা পাইলে আমার কোন আপত্তি নাই ! আমাদের কত কষ্টের টাকা, তাহা ত জানেন !"

চেক-বহি সঙ্গেই থাকিত। তাঁহার নামে সাড়ে তিন হাজার টাকার চেক লিখিয়া দিতে আমার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, "এখনই চলুন, পাকা রেজেষ্টারী করিয়া কাজ শেষ করিতে হইবে। আপনার ব্যবহার অতিশয় প্রশংসনীয়—চমৎকার !"

কিরণের মুখে কখনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখি নাই। আজ দেখিলাম, তাহার মুখ-মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রমেশ, ভাই, অপরাধ লইও না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও দান আমি গ্রহণ করি নাই !"

মনে মনে তাহাকে প্রণাম করিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম, "ইহা দান নহে। তোমার ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা। এত কাল তুমি বই লিখিয়া আসিয়াছ। প্রায় পনের-খানা বই আমি তোমার নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছি। তখন পঞ্চাশ হইতে এক-শতের বেশী তোমায় কোনখানার জন্য দেই নাই। কিন্তু আমি, এই পনেরখানা বই হইতে অন্ততঃ বিশহাজার টাকা পাইয়াছি। সেই সঙ্গে প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য আমার খাতায় তোমার নামে দুই শত করিয়া টাকা রয়ালটিস্বরূপ জমা আছে। ঘোর অসময়ে সে টাকা তোমার কাজে লাগিবে বলিয়া এত দিন তাহা তোমাকে দেই নাই। এই তিন হাজার আর আজ যে বই দিলে, তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা—সবই তোমার নিজস্ব।"

সে গাঢ়স্বরে বলিল, "রমেশ !"

আমি বলিলাম, "একঘণ্টা পরে আমি আসিয়া বৌদিকে প্রণাম করিয়া যাইব। তাঁহার নিকট আমি অপরাধী, তাঁহার মার্জ্জনা না পাইলে আমি জীবনে শান্তি পাইব না। চলুন মহাশয়।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মে—সমাজ-সংস্কার।

ব্রাহ্মধর্ম্মে—সমাজ-সংস্কারের কোন অবসর আছে কি না? না ইহা শুধু ধর্ম্মের সংস্কার? ব্রাহ্মদের মধ্যে ধর্ম্মে ও সমাজে সম্বন্ধ কিরূপ?

এই প্রসঙ্গে অনেক রকম প্রশ্ন উঠিতে পারে, এবং উঠিয়াছেও। কেহ বলিতেছেন,—ব্রাহ্মগণ মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া, নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সেই নিরাকার ব্রহ্ম নির্গুণ হইতে পারেন, সগুণও হইতে পারেন,—আধা নির্গুণ, আধা সগুণ হইলেও কাজ চলিবে। সামাজিক দিকে ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিবেন। বিবাহাদি ব্যাপারে স্ব স্ব জাতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবেন। মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া ফেলা ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়। আবার কেহ বলিতেছেন,—তাহা নয়। সমাজ-সংস্কারই ব্রাহ্ম-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতিভেদের যে শ্রেণি-বিন্যাস হিন্দু-সমাজে দেখা যায়, তাহাতে উচ্চ নীচকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তাহা এ কালের সম্পূর্ণই অনুপযোগী, তাহাতে সাম্যভাবের একান্তই অভাব। হিন্দু-সমাজে এই সাম্য-ভাবের অভাব হইতেই যত অনর্থ ও অনিষ্টের সূত্রপাত দেখা যায়। সুতরাং ব্রাহ্ম-সংস্কারের ভিতরের অভিপ্রায় সমাজ-সংস্কার। ধর্ম্ম-সংস্কার এই সমাজ-সংস্কারের অঙ্গীভূত বলিয়া ব্রাহ্ম-আন্দোলন ধর্ম্ম-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ধর্ম্মকে সমাজের একটি অঙ্গস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন; এবং সামাজিক নানারূপ দুর্গতির জন্য ধর্ম্মকেই একান্তভাবে দায়ী করিয়াছেন। যাঁহাদের চিন্তা এই দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যতীত ব্যাপকভাবে সমাজ-সংস্কার সম্ভব নয়। সমাজের পক্ষে কোন্‌টা হিত, কোন্‌টা অহিত, তাহা ব্যবস্থাপকগণ স্থির করিয়া দিতে পারেন মাত্র। কিন্তু সমগ্র সমাজে তাহাকে প্রচলিত করিবার ক্ষমতা কেবল এক রাজশক্তিরই আছে এবং থাকে। বাঙ্গলায় রাজা এখন বিদেশী। বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান কোন সমাজেরই তিনি অঙ্গীভূত নহেন। সমাজের অঙ্গীভূত নহেন বলিয়াই তিনি ইহার প্রতিনিধি হইতে পারেন না। প্রতিনিধি না হইতে পারিলে তিনি ইহার নিয়ামক ও চালক হইবেন কি প্রকারে? হিন্দু-সমাজের শাসন, পালন, রক্ষণ, সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া সমস্তই ভিতর হইতে চলে। হিন্দুর সমাজ-বিন্যাসের ইহাও একটা বিশেষত্ব। বিদেশী রাজা সমাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কাজেই এই

রাজশক্তি বাহির হইতেও আমাদের সমাজ-সংস্কার করিতে ভরসা পান না, আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে সংস্কার করিবেন, এমন সুযোগও তাঁহার নাই। সমাজ অথবা ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য, কাজেই নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের দিকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সচেষ্ট হইতে হইবে। কার্য্য-কারণ-সম্পর্কের ভিতর দিয়া যাঁহারা চিন্তা করেন, সমাজের এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের যোগ যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহারা সমাজ-সংস্কারকে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিলেও ক্রমে এইরূপে রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের চেষ্টাকেও ব্রাহ্ম-আন্দোলনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে বাধ্য।

এই সম্পর্কে, এই রকমের আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার মীমাংসার জন্য কোঁমৎ আসিতে পারেন, মিল্ ও স্পেন্সার আসিতে পারেন, রুসো ও বেন্থাম আসিতে পারেন, আর আসিয়াছেনও। আমাদের দিক্ হইতে মনু আসিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অবশ্যই অঙ্গিরা ও হারীত ঋষি আসিবেন। মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য আসিবেন। পরাশর আসিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ আসিবেন। শাস্ত্র ও যুক্তি,—যুক্তিহীন শাস্ত্র,—শাস্ত্রহীন যুক্তি,—সকলেই আসিতে পারেন এবং সকলেই আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাজ-সংস্কারের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তকগণের উক্তি ও আচরণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। কেননা, তাঁহাদের উক্তি ও আচরণ হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ কালে গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেবল প্রবর্ত্তকগণের উক্তি ও আচরণের মধ্যেই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিব না। আদর্শমূলক কাল্পনিক যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ,—ঐতিহাসিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাহা হইতে অনেকাংশেই ভিন্ন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাজ-সংস্কারের স্থান খুঁজিতে গিয়া আমরা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের আদর্শ, আশা ও কল্পনার দিকে দৃষ্টিপাত করিব, তেমনি অন্যদিকে সেই আদর্শ ও কল্পনার অনুযায়ী, কখনও বা তাহার বিরোধী যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সত্যিকারভাবে, ঘাতসংঘাতে, জয়-পরাজয়ে কিছুকাল, যে কারণেই হউক, হিন্দু সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, পরে তাহা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া—কখনও বা দেবেন্দ্রনাথ, কখনও বা কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-প্রবর্ত্তকগণের ধিক্কৃত যে গুরুবাদ এবং পৌরাণিক অবতারবাদ—তাহা হইতেও নিকৃষ্টতর 'নরপূজাবাদ' আশ্রয় করিয়া, আবার কখনও বা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, তাঁহাদিগকে অকথ্য ভাষায় গলাগালি দিয়া—রাগিয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া,—বস্তুগতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই ঐতিহাসিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর হইতে যে আদর্শ ফুটিয়া বহির হইয়াছে, তাহাও সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিব।

কল্পনা যে আদর্শ দেয়, সমাজে তাহাও বিশেষরূপে কাজ করে। ইতিহাস যে আদর্শ

দেয়, তাহাকেও উপেক্ষা করা যায় না। এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়াই কোন বিশেষ আন্দোলন এবং তৎসংশ্লিষ্ট চরিত্রবিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাজ-সংস্কারের কথা আছে কি, না,—গোড়ায় ছিল কি না?—আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ রাজা রামমোহনের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। কেন না - রামমোহনই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম পুরুষ। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরে হইলেও—দেবেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পুরুষ।

রাজা রামমোহন এ দেশে মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে একেবারে উদ্যতখড়্গ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য এই, মূর্ত্তিপূজার একটা সমর্থনও তাঁহার শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-মূলক মীমাংসার মধ্যে পাওয়া যায়। লোক-সমাজে জ্ঞানের তারতম্য বিবেচনা করিয়া মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজনীয়তাও রাজা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মে নামরূপের আরোপ করা যায় না, কিন্তু নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ করা যায়। আর নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া যে উপাসনা, তাহাও গৌণভাবে ব্রহ্মেরই উপাসনা; এবং যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এতদূর উন্নত হয় নাই যে, তাঁহারা অনায়াসেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারা নাস্তিকতার দরুণ নানারূপ মন্দকার্য্যে লিপ্ত হইয়া একেবারে উচ্ছন্ন যাওয়া অপেক্ষা মূর্ত্তির সাহায্যে অবশ্যই ব্রহ্মের এইরূপ গৌণ উপাসনা করিতে পারেন। প্রতীক ও প্রতিমাপূজার প্রাচীন শাস্ত্রীয় মীমাংসা অনুসরণ করিয়া, স্থির ধীর পণ্ডিতের মত এইরূপ বলিয়া কহিয়া তবে আবার তিনি এই মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদকল্পে দশহস্তে যুদ্ধ করিলেন কেন? এমন যুদ্ধ করিলেন যে, তখনকার দিনের মহামান্য পাদ্রীরা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া গেল। তাহারা স্পষ্টই বলিল যে, রামমোহন বাড়াবাড়ি করিতেছেন। *

ইহা গেল বাহিরের প্রমাণ। রাজার নিজের লেখার মধ্য হইতেও ইহা সমর্থন করা শক্ত নয়। রাজার বিরুদ্ধে যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কিছু সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী ভাষাও জানিতেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা ত মূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করে না। ঈশ্বরের যে বিভূতি আছে, গুণ আছে, সেই সমস্ত গুণের ভাবদ্যোতক এক একটা রূপকল্পনা করিয়া, সেই রূপকেই মূর্ত্তির আকারে প্রকাশ করা হয়। মূর্ত্তির সাহায্যে সেই রূপাত্মক গুণের প্রতি সহজেই সাধকের চিত্ত স্থির হয়। মূর্ত্তির মধ্য দিয়া রূপে, রূপের মধ্য দিয়া গুণে পৌঁছা যায়। মূর্ত্তিপূজা একটা পথ, একটা উপায় মাত্র, বস্তুতঃ মূর্ত্তিই

* "His earnest ple dings against Idolatry hd aroused the most violent opposition ; and even Europeans thought he was going too far."—Lecture on Raja Ram Mohan Roy, by Rev. K. S. Macdonald p. 9.

ঈশ্বর নয় —উদ্দেশ্য নয়। রাজা রামমোহন এইমাত্র বলিতে পারেন যে, গুণের যে রূপ-কল্পনা—তাহা কল্পনামাত্র। তাহা রামমোহন কেন, জামদগ্নির অনুবর্ত্তী হইয়া, এমন কি, রঘুনন্দন পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। * শঙ্করানুবর্ত্তী হইয়া রামমোহন ত ব্রহ্মের গুণ-কল্পনাকেও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহনের ব্রহ্ম মীমাংসায় নির্গুণ ও সগুণের সামঞ্জস্য অনেকে বলেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমি যতদূর দেখিয়াছি, নির্গুণের দিকেই রাজার মীমাংসার ঝোঁক সম্পূর্ণ। সগুণ তাঁহার মীমাংসা নয়, নিম্নাধিকারীর জন্য একটা সোপানমাত্র।

এ দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত অনেকের নিকট মূর্ত্তিপূজার এইরূপ একটা রূপক ব্যাখ্যা পাইয়া অনেক ইংরেজ এবং পাদ্রীগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে রাজা নিজেও এই রূপক ব্যাখ্যার কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়,—পাছে এই রূপক ব্যাখ্যা মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদের পথে একটা প্রবল বাধা জন্মায়, এই ভয়ে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, সম্প্রতি প্রচলিত যে মূর্ত্তিপূজা, তাহার মধ্যে রূপক ভাবের উপাসনার কোন অবসরই নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালী হিন্দুগণ পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিকেই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। † ইহা কোন শাস্ত্রীয় মীমাংসা নয়। সমাজের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া নিজের অভিজ্ঞতানুযায়ী একটা ধারণা মাত্র।

---

* The authority of Jamdagni is thus quoted by the great Raghunandan—"For the benefit of those who are inclined to worship, figures are invented to serve as representations of god, who is merely Understanding, and has no Second, no parts, nor figure, consequently to these representatives, either male or female forms and other circumstances are fictitiously assigned."—Preface to the Isha Upanished by Ram Mohan Roy.

† (I) "Some Europeans, inbued with high principles of liberality, but unacquainted with the ritual part of Hindu Idolatry, are disposed to palliate it by an interpretation which, though plausible, is by no means well founded. They are willing to imagine, that the idols which the Hindus worship, are not viewed by them in the light of Gods or as real personifications of the divine attributes, but merely as instruments for raising their minds to the contemplation of those attributes which are respectivly represented by different figures. I have frequently had occasion to remark, that many Hindus also who are conversant with the English language, finding this interpretation a more plausible apology for idolatry than any with which they are furnished by their own guides do not fail to avail themselves of

কিন্তু কেবল ইহার জন্যই কি মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ আবশ্যক? অনেকে বাঙ্গলায়, এমন কি, বাঙ্গলার বাহিরেও,—রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্তকে মাত্র এই পর্য্যন্তই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বস্তুতঃ রাজা রামমোহনকে অতি অল্পই আলোচনা করিয়াছেন। অথচ রাজা রামমোহন সম্বন্ধে অল্প আলোচনা অতিশয় বিপজ্জনক। রাজা এই মূর্ত্তিপূজার সহিত আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া তবে দেখিয়াছেন। শতাব্দীর শেষভাগে অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কালে ইহা যে কত বড় দেখা, তাহা সেই বুঝিতে পারে, যে অধুনাতন সমাজবিজ্ঞানের চক্ষু দিয়া সমাজের অংশকে সমগ্রের সহিত, এবং সমগ্রকে অংশের সহিত মিলাইয়া, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনা করিয়া ইহার জীবনী-শক্তির পরিমাণ করিতে পারে। আজ ইহা অনেকটা সহজ। কেননা, এ বিষয়ে আমরা অন্যের চিন্তার সাহায্য লইতে পারি। কিন্তু রাজা রামমোহনকে ইহা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। পৃথিবীর পণ্ডিতদিগের নিকট তাঁহার প্রতিভা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ আমাদের রাজনৈতিক হীনাবস্থাই ইহার একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ, কি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কি দেবেন্দ্রনাথ, কি অক্ষয়কুমার, কি রাজনারায়ণ, কি কেশবচন্দ্র,—অপর সাধারণের ত কথাই নাই,—রাজা রামমোহনকে অত্যন্ত বিকৃত করিয়া জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়াছেন; এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই আজ প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাজ-সংস্কারের অবসর আছে কি না?

আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির সহিত মূর্ত্তিপূজার সম্বন্ধ-বিচার, এ যুগে রাজা রামমোহনের চিন্তার ও সংস্কারের একটি বিশেষত্ব। বাঙ্গলায় প্রচলিত যে মূর্ত্তিপূজা, ইহাকেই তিনি বাঙ্গালী সমাজের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রথার একমাত্র প্রশ্রয়দাতা ও পোষণকারী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের রাজনৈতিক হীনাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও

---

it * * * Hindus of the present age, * believe in the independent existence of the objects of their idolatry as deities clothed with divine power."—Preface to the Ishopanishad—by Ram Mohan Roy.

(2) "Hindus of the present day have no such emblematical representations of the supreme Divinity, but firmly believe in the real existence of innumerable gods and goddesses, who possess in their own department full and independent power, * * * There is no doubt, however, and it is my whole design to prove that every rite has its derivation from allegorical adoration of the true Deity, but at the present day all this is forgotten"—Introduction to the Vedant—by Ram Mohan Roy.

তিনি মূর্ত্তিপূজাবহুল, জাতিভেদে বিভক্ত সমাজকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন কি? তিনি চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জাতি সকলের ন্যায় রাজনৈতিক উচ্চ অধিকার। তিনি চাহিয়াছিলেন, সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা। অবশ্য, ইহার সঙ্গে পরকালেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল, ছিল না, এমন নহে।

বেদান্ত-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নামরূপের অতীত, সমস্ত গুণের অতীত, নির্গুণ নিরাকারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জগৎ যে মায়া, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, এ কথাও তাঁহাকে বলিতে হইল। আবার এই নামরূপ-সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক জগতের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিশেষভাবে সেই নির্গুণ,অদ্বৈতবাদকেই একটা কাল্পনিক বিদ্যা বলিয়া এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট চিঠিতে, উহাকে কতমতে বিদ্রূপ করিলেন। উভয়দিকেই তিনি উগ্র চরমপন্থী। আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত স্ববিরোধী। কিন্তু একটা দিক্ হইতে ইহার সামঞ্জস্য হয় ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রামমোহন মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রকেই বাঙ্গালী হিন্দু ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে। ইহা তিনি বহুবার বহুস্থানে বলিয়াছেন। কাজেই মায়াবাদের সহায়তা লইয়া তিনি কাষ্ঠ লোষ্ট্র যে ব্রহ্ম নহেন, এ কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন। মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদকল্পেই তিনি নির্গুণবাদ ও মায়াবাদের আশ্রয় লইলেন।

কিন্তু মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ এত করিয়া তিনি চাহেন কেন? কেন না, তাঁহার মতে এই মূর্ত্তিপূজাই সামাজিক দুর্গতির কারণ এবং রাজনৈতিক দুর্গতিরও কারণ। মূর্ত্তিপূজা না হয়, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও তাহার অঙ্গীয় মায়াবাদের সাহায্যে নিরস্ত হইল। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা চলিয়া গেলেই কি সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতাবস্থা আমরা প্রাপ্ত হইব? ইস্লামে ত মূর্ত্তিপূজা নাই। তবে তাহারা কেন হিন্দুর সহিত একই দুঃখের কৃষ্ণচ্ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? একই মড়কে মরিতেছে, একই দুর্ভিক্ষে হাহাকার করিতেছে? একই নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে? প্রতিক্রিয়ার যুগে রামমোহনের বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন জাতি করিয়াছে; এবং এখন পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নই চলিতেছে।

রামমোহনের সিদ্ধান্ত এই শুধু মূর্ত্তিপূজা গেলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিজ্ঞান আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে। ইউরোপের এই জড়বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া যখন আমরা স্বাধীনভাবে ইহাকে আমাদের সমাজক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিব, তখনই—কেবল তখনই—আমরা সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারলাভে সমর্থ হইব। অবশ্য, রাজশক্তির বদান্যতার উপর রাজার যথেষ্ট নির্ভর ছিল। এ ক্ষেত্রে বেদান্তের নির্গুণবাদ ও মায়াবাদ বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবে না। কাজেই সংস্কৃত-শিক্ষার দোহাই দিয়া পাছে ভারতবাসী ইউরোপের বিজ্ঞানের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়,—এই ভয়ে রাজা রামমোহনকে একটু বিশেষভাবে চঞ্চল হইতে হইয়াছিল।

মায়াবাদকে রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের পরিপন্থী বলিয়া রাজপ্রতিনিধির নিকট বেদান্তের এই কাল্পনিক বিস্তার নিষ্ফলতা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সুতরাং মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদমূলক যে ধর্ম্মসংস্কার রামমোহন চাহিয়াছিলেন--তাহার মূলে ছিল, সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভোগ ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারলাভ। এই সম্পর্কে * মায়াবাদকে তিনি সুবিধামত অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় মীমাংসার সঙ্গতিরক্ষা এ ক্ষেত্রে তাঁহার মুখ্যলক্ষ্য হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মে—সমাজ-সংস্কারের অবসর আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া, রামমোহনের দিক্ হইতে বলিতে হয় যে, **ব্রাহ্ম আন্দোলনে সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক অধিকারলাভই উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম-সংস্কার উপায়মাত্র।**

রামমোহনের নানাস্থানের উক্তির মধ্য হইতে তাঁহার যুক্তিকে যিনি অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার সহিত একমত হইবেন, আশা করা যায়। রামমোহন গ্রীক্ ও রোমক মূর্ত্তিপূজার সহিত হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা সমাজের ভিৎকে অধিকতররূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী হিন্দু নরহত্যা এবং আত্মহত্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার গর্হিত ও অশ্লীল আচরণে উৎসাহ পাইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানের অনুশীলন বন্ধ হইয়াছে। সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা রাজনৈতিক উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে।

---

* (1) "Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society"—Introduction to the Vedanta.

(2) Idolatry practised by the Greeks and Romans was certainly just as impure, absurd and puerile as that of the present Hindus : yet the former was by no means, so destructive of the comforts of life, or injurious to the texture of Society, as the latter."—A Second Defence of the Monotheistical system of the Vedas.

(3) "The system (Idolatry) destroys to the utmost degree, the natural texture of Society, and prescribes crimes of the most heinous nature, which even the most savage nations would blush to commit."—Preface to the Kath—Upanished,

(4) " Idol worship,—the Source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles, as countenancing criminal intercourse, suicide,—female murder and human sacrifice"—Introduction to the Mundaka Upanishad.

অবশেষে তিনি স্পষ্ট বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, অন্ততঃ সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারের জন্য মূর্ত্তিপূজাবহুল প্রচলিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ বা সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ১৮২৮ খৃঃ মহামতি জন্ ডিগ্‌বির নিকট তিনি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানিতে এই মত পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে।

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feelings and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise, It is I think necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort," Extract from a letter to Mr John Digby England; dated January 18, 1828 by Ram Mohan Roy.

রাজার মনের সত্যিকার অভিপ্রায়টিও এইরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে মনে হয়, যেন তিনি ধর্ম্মকে সমাজের একটি অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, এবং

---

(5) "Idolatrous ceremonies under the pretext of honoring the All perfect Author of Nature, are of a tendency utterly subversioe of every moral principl.—A Defence of Hindu Theism.

(6) Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and Social feeling,—and moral debasement of a race who, I cannot help thinking, are capable of better things, whose susceptibility, patience and mildness of character render them worthy of a better destiny"—Introduction to the Ishapanishad.

(7) "Idolatry agreeable to the senses though destructive of moral principles and fruitful parents of prejudice and superstition"—Preface to the Ishapanishad."

(8) "Idolatrous notions have checked or rather destroyed, every mark of reason, and darkened every beam of uderstanding"—Itroduction to the Kenopanishad,

সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সম্মুখে রাখিয়া নিতান্ত গৌণভাবে ধর্ম্ম-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

আশা করা যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাজ-সংস্কারের স্থান আছে কি না? এ প্রশ্ন, রাজার দিক্ হইতে আর উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যে জেরেমি বেন্থাম যাঁহাকে সহযোগী বলিয়া সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে সমাজ-সংস্কারের একটা আদর্শ অবশ্যই আমরা আশা করিতে পারি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট "লোকশ্রেয়ঃই" রামমোহনের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ। যে উপায়ে লোকের শ্রেয়ঃসাধন করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম জানিয়া অবলম্বন করিবেন। রামমোহন এখানে একটা বিধি দিলেন মাত্র। অদ্বৈতবাদের সহিত লোকশ্রেয়ের কোনরূপ অঙ্গাঙ্গিযোগ তিনি দেখাইলেন না। লোকের শ্রেয়ের পথ যিনি অবলম্বন না করিবেন, তিনি সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট। তিনি আবার কিসের ব্রহ্মজ্ঞানী? কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানিমাত্রেই লোকের শ্রেয়োবিধান করিতে বাধ্য। রামমোহনের যুক্তি ইহার বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অন্যত্র যেখানে 'পরমেশ্বরের ত্রাস' প্রযুক্ত এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে অবশ্য তিনি অদ্বৈতবাদের ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টান নীতিবাদই রাজার সমাজ-সংস্কারের আদর্শ। একটা জাতীয় ও শাস্ত্রীয় আবরণ দিবার জন্যই তিনি লোকশ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিয়াছেন। কি এই খৃষ্টীয় নীতিবাদ? "তোমার উপর অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যের উপরেও তুমি সেই ব্যবহার কর।" ইহা বিশেষরূপেই একটা সামাজিক সাম্যবাদ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী কি ইচ্ছা করেন যে, তাঁহাকে জীবন্ত অবস্থায় মৃতা স্ত্রীর জলন্ত চিতায় দগ্ধ করা হউক? তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর প্রতি সহমরণের ব্যবস্থা কেন?

স্বামী কি ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার স্ত্রী আরও ২৫ কিংবা ৩০টি অপর স্বামীর সহিত বিবাহিতা হউন? তবে স্বামী এরূপ বহু বিবাহ করিবেন কেন?

ব্রাহ্মণ শূদ্রদিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন। বেদে এবং জ্ঞানলাভে তাহাদের অধিকার নাই সাব্যস্ত করেন। যদি শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করেন, তবে কি ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হন?

ইংরেজ আমাদের দেশশাসন করেন। ইহাতে আমরা যদি দুঃখ করি, ক্ষোভ প্রকাশ করি, তাহা হইলে সমগ্র ইংরেজজাতি আশ্চর্য্য বোধ করেন। পরন্তু বাঙ্গালী যদি ইংলণ্ড-শাসন করিত, তবে কি ইংরেজজাতি সুখী হইতেন?

এই আদর্শের অনুপাতে রাজা আমাদের সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক

অধিকারলাভের প্রয়াস করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহারই জন্য তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ইহাই গেল রাজার আদর্শ বা উক্তি। রাজার আচরণ কিরূপ ছিল? হিন্দুর অখাদ্য, অনেক সময়েই অপ্রকাশ্যে খাওয়া ভিন্ন, এবং বিলাত যাওয়া ভিন্ন, তিনি সাক্ষাৎভাবে কোথাও জাতিভেদের গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। বিশেষতঃ জাতিভেদের চিহ্নসূচক যজ্ঞোপবীত যাগযজ্ঞের বিরোধী হইয়াও তিনি আমৃত্যু ধারণ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হন, এ জন্য তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে অদ্যাপি যোগদান করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহারা মূর্ত্তিপূজাও করেন। রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসভায় জাতিভেদ বহুপরিমাণে পালন করা হইত। ব্রহ্মসভায় কেবল ব্রাহ্মণেরাই বেদ পাঠ করিতে পারিতেন। যে ঘরে বেদ পাঠ করা হইত, সে ঘরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ যাইতে পারিতেন না। * স্ত্রীশূদ্রের বেদে অধিকার-নির্ণয়ে ইতিহাস-পুরাণের মধ্য দিয়াই তিনি তাহাদের বেদে অধিকারের কথা বলিয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে স্ত্রীশূদ্রের বেদে অধিকার আছে কি না, এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের অভিপ্রায়টি বুঝা গেলেও তাঁহার বক্তব্য শাস্ত্রীয় মীমাংসার আবরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ হওয়ায় খুব স্পষ্ট হয় নাই। রামমোহনের উক্তি ও আচরণে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবের পঙ্গত্ না হয় তিনি ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তান্ত্রিকের চক্রে যে জাতিভেদ নাই, ইহা ত তাঁহার বিশেষরূপেই জানা ছিল। কিন্তু ব্রহ্মসভা ত ততদূর পর্য্যন্তও উঠিতে পারিল না।

"ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ।"

বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনায় বর্ণভেদ যতটা বর্জ্জিত হইয়াছিল, ব্রহ্মসভায় তাহাও হইল না। রাজার শৈব বিবাহে যবনীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার যে শাস্ত্র ও যুক্তির সমর্থন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। অনেকে বলেন, ইহা তাঁহার নিজের দিক্ হইতে একটা ব্যক্তিগত সমর্থন। আমরা কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা অসবর্ণ-বিবাহের অতি উদার সমাজ-সংস্কারেরই আভাস ইহার মধ্যে পাই।

রাজার আচরণ যেরূপই হউক—তাঁহার সমাজ-সংস্কারের আদর্শে জাতিভেদের স্থান নাই, এ কথা খুব জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

---

* "Caste, however, was to some extent maintained; the holy texts were chanted by holy men (the Brahmans) in an adjoining room, in to which none but the Brahmans could enter, The Society Brahma Somaj was thus formed"—Hinduism Past and Present p-225 by J, M, Mitchell M, A, L, LD.

রাজার পরে আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মসভায় কোন নূতন সংস্কার আনিতে পারেন নাই। তিনি অগ্নিহোত্রীর মত ইহাকে রক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ইহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একটা প্রধান কার্য্য। ঐতিহাসিকের চক্ষে এই কার্য্যের গুরুত্ব খুব বেশী।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসভায় যোগদান করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ হইতে ১৮৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এই পঞ্চবিংশতি বৎসর অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণকে পরে পরে সঙ্গে লইয়া তিনিই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের এই ২৫ বৎসর দেবেন্দ্রনাথেরই ইতিহাস।

এই ২৫ বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন। এই ২৫ বৎসরে—

—ক) ব্রহ্মসভা হইতে অদ্বৈতবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে।

—খ) রামমোহনের অদ্বৈতবাদ-ঘেঁষা উপাসনা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

—গ) বেদের পরিবর্ত্তে দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-প্রত্যয় ও সহজজ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি করা হইয়াছে।

—ঘ) দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' রচিত হইয়াছে। ইহাতে সগুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। "জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ চিন্তনও" ছাড়িয়া দিয়া, ঈশ্বরের সহিত 'উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ' স্থাপন করিয়া তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

—ঙ) ব্রাহ্মদিগের সামাজিক "অনুষ্ঠান-পদ্ধতি" দেবেন্দ্রনাথ নিবদ্ধ করিয়াছেন।

ছোটখাটো এই রকম আরও দু'চারিটা সংস্কার হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে এইগুলির সহিতই দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও বেদবর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি অক্ষয়কুমারের নিকট ঋণী। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির জন্য তিনি "ধর্মতত্ত্বদীপিকার" রচয়িতা, তাঁহার অকৃত্রিম যৌবনসুহৃৎ রাজনারায়ণ বাবুর নিকট ঋণী। কেশবগণ বলেন, আত্মপ্রত্যয়ের সহিত যে সহজ জ্ঞান তিনি শেষে জুড়িয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি কেশবচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

১৮৪২ হইতে ১৮৬৬ খৃঃ এই ২৫ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মে সমাজ-সংস্কারের কোন ইতিহাস আমরা পাই না। অথচ বাঙ্গলাদেশে কলিকাতা মহানগরীতে—এই ২৫ বৎসরের মধ্যে সমাজ সংস্কারের প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে তাহার তরঙ্গ আসিয়া যে আঘাত না করিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে সেই সংস্কার-স্রোত উত্থিত হয় নাই। সে স্রোত উত্থিত হইয়াছে হিন্দুসমাজের পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া। পাষাণ ফাটাইয়াই ত ঝরণা বাহির হয়।

এই আট কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে, যিনি একাকী পর্ব্বতের মত গর্ব্বিত শির লইয়া পথ চলিয়াছেন, বঙ্গ-বিধবার কত জন্মজন্মান্তরের শোকাশ্রু, যাহা কেহ চাহিয়া দেখে নাই, তাহা তাঁহারই পঞ্জরাস্থির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া, সহসা একদিন তাঁহারই বুক ফাটাইয়া দিয়া, হৃষীকেশের গঙ্গার মত বিরাট্ প্লাবনে বাঙ্গলাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সে দিন দেবেন্দ্রনাথ কোথায়?

১৮৫৬ খৃঃ ১১শে আশ্বিন দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া, বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; আর ত তাঁহাকে দেখা গেল না।

তিনি ফিরিয়া আসিলেন আর সেই ১৮৫৮ খৃঃ ১লা অগ্রহায়ণ। মাস কাটিয়া যায়, বৎসর কাটিয়া যায়, দেবেন্দ্রনাথ কোথায়? মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, অমৃতসর; শেষে হিমালয়ের শৈলশৃঙ্গে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বাঙ্গলার সমাজে ভূমিকম্প হইল। আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে গৈরিক স্রাব নির্গত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন, বিধবার বিবাহ দিতে হইবে, এবং শাস্ত্রে তাহার সমর্থন আছে। দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতকালের মধ্যে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন উত্থিত হইল এবং রাজদ্বারে তাহা বিধিবদ্ধ হইল।

রামমোহনের পরে সংস্কারক্ষেত্রে এত বড় সিংহ গর্জ্জন বাঙ্গালী আর শুনে নাই। এখন যে যুগের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িলাম, ইহা বিদ্যাসাগর-যুগ। এ যুগ-তরঙ্গে বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথ পিছাইয়া গেলেন।

যাঁহারা বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নামও খুঁজিলে পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার দুই ভ্রাতাকে বিধবা-বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে রাজনারায়ণ বাবু এই বিধবা-বিবাহের সংবাদ দেন। তাহাতে অমৃতসর হইতে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিলেন—"এই বিধবা-বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে, তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" অক্ষয়-কুমারও বিধবা-বিবাহের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন,—"আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবা-বিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনা-দিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্-কালেও যাইবেক না।" দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ এই তিন ব্রাহ্মনেতাই বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিলেন।

বিদ্যাসাগর যদি ব্রাহ্ম হইতেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে বিধবা-বিবাহ এক অতি স্মরণীয় সমাজসংস্কাররূপে স্থান পাইত। 'বোধোদয়ে'র ধর্ম্মমত যাহাই হউক, সমাজের দিক্ দিয়া বিদ্যাসাগর হিন্দু ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিধবা-বিবাহরূপ সমাজ-সংস্কার, ব্রাহ্ম-প্রবর্ত্তকগণ উদ্ভাবন করেন নাই, হিন্দুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম, বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়ের পরে, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে অনেক পিছাইয়া পড়িল।

হিন্দুসমাজ ও হিন্দু মনীষাই এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কোন স্তরেই বিদ্যাসাগর "আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত" ছিলেন না। এইখানেই ব্রাহ্ম সংস্কারকগণ হইতে তাঁহার পার্থক্য। আর এইখানেই রামমোহনের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথ এই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন আন্দোলন করিলেন না, উৎসাহ দেখাইলেন না, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বিধবা-বিবাহের কোন অনুষ্ঠানও দেখা গেল না। এত বড় ধনকুবের তিনি, বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়া যখন সর্ব্বস্বান্ত, ঋণজালে জড়িত, তখনও প্রিন্স দ্বারকানাথ-পুত্রকে মুক্তহস্তে বিদ্যাসাগরের পশ্চাতে এক পদও অগ্রসর হইতে দেখা গেল না। কাজেই শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যে তাঁহার কেশব-চরিতে লিখিয়াছেন "Devendra, however, could never reconcile himself to the idea of marrying widows. * * * widow marriage was to him a disagreeable thing." অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ বিধবা-বিবাহ পছন্দ করিতেন না—বিধবা-বিবাহ তাঁহার অপ্রীতিকর ছিল, ইহা মিথ্যা কথা বলা যায় কিরূপে?"

দেবেন্দ্রনাথের আচরণ দেখিয়া শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবুকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আমি পাই না। আর এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ে প্রতাপ বাবুর মত লোক কি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন? মনে হয় না। শুধু মনে হওয়া, না হওয়ার কথা নয়; ইহার একান্ত প্রমাণাভাব।

যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক, রামমোহনের সতীদাহনিবারণের পরে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহই ১৯শ শতাব্দীর ইতিহাসে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে দ্বিতীয় সমাজ-সংস্কার। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহনের পরে সমাজ-সংস্কারক, দেবেন্দ্রনাথ নহেন, বিদ্যাসাগর।

অনেকে বলেন, বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। হইলেনই বা নাস্তিক। কে মাথা কিনিয়া লইয়াছে যে, দেশশুদ্ধ সকল আহাম্মকে মিলিয়া আস্তিক হইতে হইবে? আর কেই বা বলিতে পারে, দেবেন্দ্রনাথের বেদ ও অদ্বৈতবাদবর্জ্জন আর বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র

ও যুক্তিমত বিধবা-বিবাহসমর্থন লইয়া ইহাঁদের মধ্যে কে রাজা রামমোহনের অধিকতর নিকটবর্ত্তী? বিদ্যাসাগর রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়াছিলেন? রামমোহন কি তাহা হন নাই?

এই কালের মধ্যে, সিপাহী-বিদ্রোহ হইয়া গেল। লোকে বলিল, কোম্পানী বিধবা-বিবাহে মত দিয়াছে বলিয়া সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছে। ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক বৎসর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বাঙ্গলায় একটা স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় হইতেই দেখা যায়। অবশ্য, রাজা রামমোহনের সময় হইতেই স্যার রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষাকল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। রাধাকান্তের পরে এ দেশীয়-দিগের মধ্যে বিদ্যাসাগরই স্ত্রীশিক্ষার জন্য মনোযোগী হয়েন। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতৃগণ বিদ্যাসাগরকে এ ক্ষেত্রেও অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। ব্রাহ্মনেতৃগণ স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়েও অগ্রণী হইতে পারেন নাই। হিন্দু-সমাজের স্যার রাধাকান্তও বিদ্যাসাগরের পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়াছেন। অবশ্য, ইহা ভালই করিয়াছেন।

এই সময়ে নীলের হাঙ্গামায়, বাঙ্গলার কোন কোন অংশের প্রজারা অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সাহিত্য, প্রজার এই দুঃসহ অপমানে গর্জ্জিয়া উঠিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সে দিন বাঙ্গলায় সত্যই মরাগাঙ্গে বান ডাকিল। লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্ম্মঘট করিল, তাহারা বলিল, "আর নীলের দাদন লইব না, নীলের চাষ করিব না।" এত বড়—যাহাকে ইংরেজীতে বলে Labour strike, অথচ তাহার ইতিহাস নাই। আমার মনে হয়, ইহা Labour strike হইতেও আরো কিছু বেশী। "পেট্রিয়ট" প্রতিবাদের বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের মা বলিতে লাগিলেন,—"ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে, মারা পড়্‌বি, ওরে, কলম রাখ্‌।" যে মানুষ পরের জন্য মরিতে আসিয়াছে, সে কলম রাখিতে পারে না। যে কলম রাখিতে পারে, সে পরের জন্য মরিতে পারে না। হরিশ বলিলেন, "মা, তোমার সব কথা শুন্‌বো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি, তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, এ কাজ না ক'রে আমি ঘুমাতে পারবো না।"

হরিশ ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে ইংরেজী বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। দুঃখের বিষয়, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া তিনি মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যখন নীলকরদের অত্যাচারে গরীব প্রজারা ধনেপ্রাণে সারা হইতেছিল, তখনই বা দেবেন্দ্রনাথ কোথায়? তিনি না বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক? কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়, হরিশ্চন্দ্রের নীলের হাঙ্গামায় প্রজার পক্ষসমর্থন, আর দেবেন্দ্রনাথের নিরুপদ্রবে হিমালয়ের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ, ইহার মধ্যে কোন্‌টি রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকতর নিকটবর্ত্তী?

যে ব্রাহ্মধর্ম বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের দিনে, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে, গরীব প্রজাদের সর্ব্বস্বান্ত হইবার দিনে, নিরুপদ্রবে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেড়াইতে পারিয়াছে, তাহা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মে—সমাজ-সংস্কারের ও রাজনৈতিক অধিকারলাভের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার একান্তই অভাব দেখা যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মে—সমাজসংস্কার ব্যাপারে, দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন হইতে ভ্রষ্ট, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

রামমোহনের প্রতিভাই যে কেবল দেবেন্দ্রনাথে ছিল না, তাহা নয়। সমাজের এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গিযোগ রামমোহন দেখিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পান নাই। এমন কি, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ, সেই আদর্শই দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে পরিস্ফুট ছিল না। নতুবা তিনি রাজনারায়ণ বাবুর নিকট একখানি চিঠিতে বলিলেন কিরূপে যে, "জাতিভেদ যে না থাকে, তাহা কিছু আমাদের মুখ্যলক্ষ্য নহে। আমাদিগের লক্ষ্য যে, জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়।" কিন্তু রামমোহনের সিদ্ধান্ত এই, রাজনৈতিক উচ্চাধিকার ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতালাভের নিমিত্তই বর্ত্তমান প্রচলিত মূর্ত্তিপূজাকে পরিহার করিতে হইবে। মহাত্মা ডিগ্‌বির নিকট চিঠিতে তিনি এ কথা খুলিয়া বলিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ব্রাহ্মদের নিরাকার মত পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ আর একখানি পত্রে উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে লেখেন যে, —"একমাত্র পৌত্তলিকতা-পরিহারের জন্যই এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব, এবং রাম-মোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন।"

এই প্রবন্ধের গোড়াতে আমি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবেই দেখাইয়াছি যে, একমাত্র পৌত্ত-লিকতা পরিহারের জন্যই এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব নয়। যে পৌত্তলিকতা পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কার নাই, রাজনৈতিক উচ্চাধিকার লাভের চেষ্টা নাই, তাহা রাম-মোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। রামমোহন ভাল করিয়াছিলেন, কি মন্দ করিয়াছিলেন, ভুল করিয়াছিলেন, কি ঠিক করিয়াছিলেন, সে কথা নয়। কথা হইতেছে—ইতিহাস বিচার ও চরিত্রবিশ্লেষণ লইয়া। সে দিক্ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিরর্থক রাজা রামমোহনের কথা তুলিয়াছেন। ইহা না তুলাই ভাল ছিল।

ধর্ম্ম, রাজশক্তি ও সমাজ ইহাদের পরস্পর স্বাধীনক্ষেত্র অথচ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিযোগ রামমোহনের মত দেবেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

গণিকাতন্ত্র সাহিত্য

৩

বস্তুতন্ত্রতার প্রভাবে এক শ্রেণীর বেশ্যাচিত্র সাহিত্য-চিত্রশালায় আমদানি হইতেছে, পূর্ব্বপ্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে তাহা বুঝাইয়াছি। এক্ষণে, রোম্যান্টিক রীতির প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যে আর দুই শ্রেণীর বেশ্যাচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দেখাইব। এ ক্ষেত্রে সুরুচি ও সুনীতির তরফ হইতে আপত্তিকর বিশেষ কিছু নাই, তবে দুই এক স্থলে ঝোঁকের উপর যেন লেখকগণ একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, হয় ত কেহ কেহ ইহাকে Unhealthy, Sickly, Morbid, অস্বাস্থ্যকর বলিবেন। যাহা হউক, সেরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

রোম্যান্টিক রীতির কথা পূর্ব্বে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য সেই আলোচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—"রোম্যান্টিক রীতির আবির্ভাবে ভাবুকগণ জগতের সকল বস্তুতেই একটা বিস্ময় বোধ করেন এবং একটা আনন্দলাভ করেন; তাঁহারা সাধারণ জীবনকে শাদাশিধে, একঘেয়ে ও কুৎসিত বলিয়া উড়াইয়া দেন না, পরন্তু তাহার ভিতরেও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং করুণরসের, প্রকৃত কবিত্বের পুঞ্জীকৃত উপাদান দেখিতে পান।—এই ভাবের ভাবুক হইয়া তাঁহারা আরও বুঝিতেছেন যে—গোবরগাদায়ও পদ্মফুল ফোটে, কয়লার খনিতেও হীরা থাকে। এই মন্ত্রের প্রভাবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় কবিগণ শুধু পতিতজাতির মধ্যে কেন, পতিতাদিগের হৃদয়েও দেবভাব দেখিয়াছেন এবং সাহিত্যে সেই সুন্দর ও সত্যের বিকাশ করাইয়াছেন।" (সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪।)

আবার ইহা শুধু সাহিত্যের একটা ধারা নহে, ইহার পশ্চাতে humanitarianism) প্রভৃতির মানবিকতা প্রভৃতি সমাজনীতির ব্যাপারও কার্য্য করিতেছে যেমন পতিতজাতির উন্নয়নের চেষ্টার সহিত নিম্নশ্রেণীর নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কা, মহত্ত্ব-দেবত্ব বর্ণনাত্মক সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেইরূপ পতিতাদিগের উদ্ধারের (reclaiming) চেষ্টার সহিত পতিতাদিগের এই শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিবার সাহিত্য-চেষ্টারও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সামাজিক ও সাহিত্যিক উভয়বিধ চেষ্টাই

বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারই ফলে কুলটাদিগের Fallen sister, unfortunate অর্থাৎ পতিতা ভগিনী, অভাগিন প্রভৃতি কোমল,করুণাব্যঞ্জক, সমবেদনার উন্মেষক নামকরণ হইয়াছে। এই ভাবের প্রেরণায় বার্ণার্ড শ অম্লানবদনে Mrs. Warrenএর শ্রেণীর নারীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"The woman in the street, whose spirit is of one substance with our own and her body no less holy;" মার্কিণ কবি Walt Whitman কুলটার উদ্দেশে The City Dead-house কবিতা লিখিয়া তাহাকে The divine Woman বলিয়াছেন; 'এসিয়ার রাজকবি' এই সুরে সুর মিলাইয়া ('চৈতালী'—'সতী') গায়িয়াছেন:—

'পতিতা রমণী,
মর্ত্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্ব্বে গরবিনী যত,
সাধুগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কি জানিবে বার্ত্তা, অন্তর্য্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্বকাহিনী।'

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও কোন কোন স্থলে ব্যক্তিগত-ভাবে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে। বস্‌ওয়েলের বিখ্যাত গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্‌সন্ একজন দরিদ্রা রোগগ্রস্তা গণিকাকে স্কন্ধে করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন ও তাহার চরিত্র-সংশোধন করিয়া তাহাকে সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। (বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও উদার করুণাপ্রবণ হৃদয় রাজপথে দণ্ডায়মানা গণিকার উপবাসকাহিনী-শ্রবণে বিগলিত হইয়াছিল এইরূপ গল্প শুনিয়াছি।) উক্ত শতাব্দীতেই ডিফো 'Moll Flanders' আখ্যায়িকায় ঐ কল্পিত নামের গণিকার চরিত্র-সংশোধনের ইতিহাস দিয়াছেন। যাহা হউক, এরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত সামাজিক সমবেত চেষ্টার বা সাহিত্যিক নবপ্রবর্ত্তিত ধারার ফল নহে, ব্যক্তিবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদারহৃদয়তার ফল।

ইহারও পূর্ব্বে রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের সাহিত্যে এই শ্রেণীর নারীর শুধু (realistic) বাস্তবচিত্র কেন, তাহাদেব চরিত্রশোধনের অথবা তাহাদের অকৃত্রিম প্রণয়ের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, অর্থাৎ গণিকা-চরিত্রের ভাল দিক্‌টা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও এ সময়ে Romantic Movementএর জন্ম হয় নাই, তথাপি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী Renaissance নবজাগরণের প্রভাবে এলিজাবেথের আমলের সাহিত্যে এই নব ভাবের সঞ্চার

হইয়াছিল। কেননা, ইহারও প্রভাবে মানবপ্রকৃতির নূতন নূতন দিকে সৌন্দর্য্যানুভব ও আনন্দলাভ এবং সেই সৌন্দর্য্য-আহরণের ও আনন্দ-বিতরণের চেষ্টা কবিহৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মিড্‌ল্‌টনের 'Witch' নাটকে বেশ্যা প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদে অকৃত্রিম শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এইরূপ চিত্র আছে। হেউডের 'The English Traveller' নাটকে বেশ্যার প্রণয়ে কপটতা নাই, ব্যবসাদারী নাই, বাড়ীওয়ালী তাহাকে ব্যবসাদারী শিক্ষা দিতেছে, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না, এইরূপ চিত্র আছে। ডেকারের 'The Converted Courtesan' নাটকের প্রথম খণ্ডে চরিত্রবান্ যুবক Hippolyto গণিকা Bellafrontকে এমন জ্বলন্ত ভাষায় তাহার কুৎসিত বৃত্তির কথা বুঝাইলেন যে, তাহার এতদিনের আচরিত জীবনযাত্রার প্রণালীর উপর ঘৃণা জন্মিল ও সে সৎপথ অবলম্বন করিল। উপকারী যুবকের প্রতি উক্ত গণিকার কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হইল, কিন্তু যুবক সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন, কেননা, তিনি তখন পরলোকগতা প্রণয়িনীর স্মৃতিধ্যানে তন্ময়। নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে আবার উক্ত যুবক সংশোধিতচরিত্রা বিবাহিতা Bellafrontএর প্রণয়-যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু নারী এখন চরিত্রের দৃঢ়তাবলে দ্বিচারিণী হইতে অসম্মত হইল। উভয়েরই প্রকৃতির কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

সংস্কৃতসাহিত্যে গণিকা-দারিকা বসন্তসেনা মৃচ্ছকটিকে ও ভাসের নবাবিষ্কৃত নাটকে একটি উজ্জ্বল রত্ন। বসন্তসেনার মাতা পুরাদস্তর পেশাদার, কিন্তু বসন্তসেনা গোবর-গাদায় পদ্মফুল। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' যদি কোথাও সত্য হয়, তবে সে এইখানে। বসন্তসেনার অকৃত্রিম প্রণয় ও তজ্জনিত স্বার্থত্যাগের চিত্র অতি সুন্দর ও মনোহর। দশ-কুমারচরিতে (অপহারবর্ম্ম-চরিতে) রাগমঞ্জরী ও (মিত্রগুপ্তচরিতে) চন্দ্রসেনাও এক-নিষ্ঠ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। তবে এ চিত্রদ্বয় কবি সংক্ষেপে সারিয়াছেন।

এক্ষণে হালের সাহিত্যের কথা বলি। প্রবন্ধের বর্ত্তমান অংশে আলোচিত তৃতীয় শ্রেণীর গণিকাচিত্রে এই মূল-মন্ত্র কার্য্য করিতেছে যে বেশ্যার প্রণয় আকাশকুসুম, বন্ধ্যা-পুত্র, শশশৃঙ্গের নায় অসম্ভব নহে, অজাগলস্তনের ন্যায় অশোভন ও অনাবশ্যকও নহে, ইহাদেরও হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়ের উদয় হইতে পারে, (Oscar Wildeএর ভাষায় বলিতে গেলে, Love passed into the house of Lust) * এবং তখন সেই পবিত্র প্রভাবে পতিতা নারীর চরিত্রে দেবীত্ব ফুটিয়া উঠে, পরশ-পাথরের স্পর্শে রাং সোণা হয়।

হালের ইংরেজী সাহিত্যে জর্জ্জ মেরিডিথের 'The Ordeal of Richord Feverel' আখ্যায়িকায় Mrs. Mount নাম্নী বারবনিতাকে একজন পুরাতন প্রণয়ী নীচ স্বার্থসিদ্ধির

---

* Oscar Wilde : "The Harlot's House.

উদ্দেশ্যে নায়ককে জাহান্নমে দিবার অনুরোধ করিয়াছিল এবং বহুধন উৎকোচ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। বারবনিতা কিছুদিন উৎসাহের সহিত এই পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত ছিল, কিন্তু শেষে সে নায়কের প্রতি প্রণয়বতী হইয়া এই অনিষ্টচেষ্টা হইতে বিরত হইল, এবঞ্চ নায়ককে সৎপথে ফিরিতে প্রবৃত্তি দিল ও প্রতিশ্রুত উৎকোচ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল।

হালের বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশ্যার হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়ের উদ্ভবের অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ('মেজদিদি' পুস্তকে) 'আঁধারে আলো' গল্পে বিজলী, 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখী, ও 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'তে রাজলক্ষ্মী ওরফে পিয়ারী তিনটি উজ্জ্বল চিত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি বাল্যপ্রণয়ের জের, প্রথম দুইটি দৃষ্টান্তে নায়কের তীব্র ঘৃণার প্রভাবে পতিতার হৃদয়ে পাপাচারের জন্য অনুশোচনা, নায়কের প্রতি গভীর অনুরাগ ও সৎপথে জীবনযাত্রার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তৃতীয়-টিতেও ঠিক এই ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রথম গল্পটি হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।—'বিজলী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী। আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবু যে এটা তাহার নারীদেহ। তাহার লাঞ্ছিত, অর্দ্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।' গল্প তিনটির আখ্যানবস্তু যেমন প্রাণস্পর্শী, আর্টও তেমনি নিখুঁত। শুধু সংক্ষিপ্তসার দিয়া গল্প তিনটির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বুঝান অসম্ভব। সুতরাং সে চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকিলাম। আশা করি, তিনটিই পাঠকদিগের সুপরিচিত।

এইরূপ, নায়কের তীব্র ঘৃণার প্রভাবে গণিকার হৃদয়ে প্রেমের উদ্ভব শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের ('নির্ঝর' পুস্তকে) 'অভিনেতা' গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। এই গল্পের নায়ক গোবিন্দলাল-ভূমিকায় রোহিণীর ভূমিকার অভিনেত্রী বেশ্যাকে পদাঘাত করিল। সেই পদাঘাতেই পতিতার হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইল।

'নারায়ণে' প্রকাশিত (পৌষ ১৩২১) 'ডালিম' গল্পে উক্ত নামধারিণী গণিকার মনে আগে হইতেই কুপথে যাওয়ার জন্য অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর এক শুভ-রাত্রিতে প্রমোদ-উদ্যানে গীতবাদ্য-আমোদপ্রমোদের মধ্যে এক-জনের নিকট প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়া তাহার জীবন-প্রবাহ ফিরিল, সে আবার নূতন করিয়া নূতন প্রণয়ীর সহিত ভোগসুখে গা না ঢালিয়া এই 'প্রাণের পরশের স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া' রাখিবার জন্য, এই প্রেমের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সংসার হইতে, এমন কি, প্রণয়ীর নিকট হইতেও অদৃশ্য হইল।

রবি বাবুর 'বিচারক' গল্পে দেখা যায়, ক্ষীরোদা পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলেও প্রণয়াস্পদের বহুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত প্রীতি-উপহার আংটীটি চিরদিন রক্ষা

করিয়াছিল, দারিদ্রের তাড়নায়ও বিক্রয় করে নাই, প্রণয়াস্পদের বিশ্বাস-ঘাতকতায়ও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অভাগিনী' গল্পের (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৫) নায়িকা অভাগিনীর একজন যুবক সর্ব্বনাশ করে; যুবক পরে গা-ঢাকা দিলে নারী অগত্যা পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। অনেকদিন পরে প্রবঞ্চককে দেখিয়া অভাগিনীর হৃদয় এতই অশান্ত হইল যে, সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। অভাগিনীর পরিণামের জন্য সমবেদনার উদ্রেক করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপলহরী'তে মালতী বেশ্যাকন্যা নহে, পুনর্ভূ-কন্যা অর্থাৎ বিধবাবিবাহের সন্তান; সে যৌবনে বেশ্যাবৃত্তির জন্য শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছিল; তাহার কিন্তু এ পাপ-ব্যবসায়ে অপ্রবৃত্তি ছিল। একটি চরিত্রবান্ যুবকের সহিত অন্যোন্যানুরাগ হওয়াতে সে তাহার বিবাহিতা পত্নী হইয়া সৎপথে থাকিতে, গৃহস্থবধূর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইতে আগ্রহান্বিতা হইয়াছিল। কিন্তু যুবকের মুখে সে যখন শুনিল যে, গৃহস্থের গৃহিণী বা কুলবধূ হওয়া তাহার জন্মগত দোষের জন্য অসম্ভব, তখন তাহার গভীর নৈরাশ্য হইল। গল্পটিতে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে, সংক্ষেপে ব্যক্ত করা চলে না।

৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে কীর্ত্তনওয়ালীর কন্যা ফুলী, প্রাচীন সাহিত্যে বসন্তসেনার ন্যায়, গোবরগাদায় পদ্মফুল। তাহার সৎপথে থাকিবার আগ্রহ, পরোপকারে আত্মনিয়োগ, ও পরের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন, আদর্শ-চরিত্র মন্মথর প্রতি পবিত্রপ্রণয়ের ও মন্মথ-প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবের ফল।

এই স্থলে বলিয়া রাখি, বেশ্যাকন্যার এরূপ মতিগতি হওয়া নিতান্ত কবিকল্পনা নহে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে (৫ম পরিচ্ছেদে) ঢাকা সহরের বেশ্যাকন্যা লক্ষ্মীমণির ইতিহাস প্রকৃত জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত। কয়েকজন উন্নতহৃদয় ব্রাহ্মের চেষ্টায় তাহার সৎ-সংকল্প পূর্ণ হইয়াছিল, সে মাতার খর্পর হইতে উদ্ধার পাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুর হরিদাস

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর পনর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত হরিদাস ঠাকুরের জীবনের বিশেষ কোনও ঘটনার উল্লেখ গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয় না। এতাবৎকাল তিনি শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণকথায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ও নামজপব্রত-উদ্‌যাপনে অতিবাহিত করিতেছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়াও থাকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কিশোর-যৌবনে অধ্যাপনা শেষ করিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের মাঝে স্বীয় উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত, যখন শ্রীঅদ্বৈত স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এত ব্রত-উপবাস করিয়া গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যাঁহার নামে হুঙ্কার করিয়াছিলেন, ইনিই তাঁহার সেই প্রাণের ঠাকুর; যখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরিসংকীর্ত্তনের মাঝে সেই কনক-পুত্তলিয়া শচী-দুলালের ভুবনমোহন নর্ত্তন ও ভাবাবেশ দেখিয়া ভক্তবৃন্দ দেহ-গেহ ভুলিয়া অহর্নিশি গৌর-প্রেমে উন্মত্ত; যখন তাহার প্রেমে মাতোয়ারা অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া গৌরপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছেন; যখন গৌরপ্রেমে শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়; সেই সময় হইতে আবার নানা ভাবের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের ভক্তিবিলসিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয়।

একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সপ্তপ্রহরব্যাপী মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ সকল ভক্ত লইয়া মহাভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবের আবেশেই এক এক করিয়া সকলকে নিকটে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—"হরিদাস! তুমি আমার দেহ হইতেও অধিক প্রিয়। তোমাকে নিষ্ঠুরেরা যে বাজারে বাজারে প্রহার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই আঘাত এখনও আমার অঙ্গে বাজিতেছে। ধন্য তুমি! যাহারা এত লাঞ্ছনা দিয়া তোমাকে মারিল, তুমি তাহাদের কল্যাণকামনা করিয়াছিলে!"

"পাপিষ্ঠ যবনে তোমা দিল বড় দুঃখ,
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক।
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে,
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর বহু স্তব-স্তুতি করিয়া একান্ত দৈন্যসহকারে বলিলেন—"শ্রীশচীনন্দন! আমি তোমার চিরদাস। আমাকে এই কৃপা কর, আমি যেন তোমার ভক্তের দুয়ারে কুক্কুর হইয়া থাকিতে পারি। যাঁহারা তোমার সেবক, তোমার দাস, আমি যেন তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট পাইয়া কৃতার্থ হই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—

"তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে,
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে।
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল,
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জগাই-মাধাই।

এ স্থলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। রাঢ়দেশে একচক্র নামক এক গ্রামে দ্বাপরযুগে পঞ্চপাণ্ডব একবৎসরকাল অজ্ঞাত বনবাসে ছিলেন। উহার বর্ত্তমান নাম একচাকা। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই একচাকা গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রাঢ়ীয় শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বাল্যকালেই পিতা-মাতা তাঁহাকে এক পরিব্রাজক সাধুর হস্তে সমর্পণ করেন। নিত্যানন্দচন্দ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের প্রায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হয়েন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, যিনি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ, আর যিনি রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব, তিনিই এ যুগে পদ্মাবতীকুমার শ্রীমন্নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার।

"তের শত পঁচানব্বই শকে মাঘমাসে,
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে।
ব্রজে বলরাম যেঁই সেঁই নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ।"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমনের পর হইতে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রতিদিন জমাট হরিসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, এমন কি নিশীথকালে পর্য্যন্ত গৌর-নিতাই ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন। এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাসঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—

"শুন শ্রীপাদ! শুন হরিদাস! তোমাদিগের উপর আমি একটি বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেছি। অন্ত হইতে তোমরা দুই জনে এই নবদ্বীপের ঘরে ঘরে যাইয়া সকলকে হরিনাম লওয়াইবে। দেখ, শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া জীব কত দুঃখ পাইতেছে। তোমরা যাহাকে দেখিবে, অবিচারে তাহাকেই কৃষ্ণনাম শুনাইবে ও শ্রীকৃষ্ণভজন উপদেশ করিবে। ইহা ভিন্ন আর কোন কথা বলিবে না, বলাইবেও না। দিবাশেষে আসিয়া তোমাদের প্রচারের বৃত্তান্ত আমাকে জানাইবে।"

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতে নগরে বাহির হইলেন। গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা নিত্যানন্দ একেই ত অষ্টপ্রহর ভাবে ডগমগ, তাহাতে আবার গৌরাঙ্গের আদেশ। ঐ দেখ, প্রেমে মত্ত নিতাইচাঁদ মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় কেমন হেলিয়া দুলিয়া নদীয়ার রাজপথ দিয়া যাইতেছেন। নিত্যানন্দের অবধূত-বেশ, সুবলিত গঠন, উন্নত দেহ, চিক্কণ শ্যামবর্ণ। নিতাইচাঁদ নদীয়ার বাজার আলো করিয়া যাইতেছেন। জীবের দুঃখে নিরন্তর অন্তর দহিতেছে, তাই বুঝি কমলদলের ন্যায় বিস্তৃত রাতুল যুগলনেত্র করুণায় ছল-ছল করিতেছে। নিতাই আগে আগে যাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে নাম-রসে ভরপুর হইয়া হরিদাস ঠাকুর যাইতেছেন। নিত্যানন্দ নবীন যুবক, হরিদাস প্রবীণ বৃদ্ধ। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে সদাই চঞ্চল, হরিদাস স্থির-গম্ভীর। উভয়েরই সাধুর বেশ। তাঁহারা নদীয়ার ঘরে ঘরে যাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে।"

আরও বলিলেন—

"কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন,
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।"

(শ্রীচৈ ভাঃ)

উভয়ের সাধুর বেশ দেখিয়া, যাঁহারা একটু ভাল লোক, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভিক্ষার জন্য সনির্বন্ধে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিতাই-হরিদাস বলিলেন, "ভাই, আমরা অন্য কিছুর প্রার্থী নহি, এইমাত্র ভিক্ষা চাই যে, তোমরা বদন ভরিয়া কৃষ্ণনাম লও, আর কৃষ্ণের ভজনা কর।" তাহা শুনিয়া কেহ বলিলেন, "আচ্ছা, ভাল কথাই ত, তা করিব।"

অপর কেহ কেহ বলিলেন, "এই দুইজন বলে কি? বুঝি বা ইহারা মন্ত্রদোষে পাগল হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের মাথা খারাপ হইয়াছে। সে-ই সকলকে নষ্ট করিতেছে। কত ভব্যসব্য লোক নিমাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া একবারে উচ্ছন্ন গিয়াছে।" আবার কেহ কেহ বলিলেন, "এ দুই বেটা নিশ্চয় চোর। দিনের বেলা সাধু সাজিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষার ছলে বেড়ায়, আর রাত্রে আসিয়া সিঁদ কাটে। ইহাদিগকে দেয়ানে ধরাইয়া দিলে আক্কেল হয়।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস সকলের উক্তি শুনিয়া হাসেন, আর বলেন, 'প্রভু ভাল হরিনাম লওয়াইতে পাঠাইয়াছেন!' এইরূপে পরম কৌতুকে দুই জনে নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট দিবসের প্রচার-বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর একদিন প্রচারে বাহির হইয়া দেখিলেন, পথের মধ্যে দুই প্রকাণ্ড মাতাল আস্ফালন পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। তাহারা ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় ছুটিয়া পথের লোকদিগকে তাড়া করিতেছে, গালি পাড়িতেছে, আবার কখনও বা নিজেরাই দু'জনে কিলাকিলি চুলাচুলি করিয়া মাটীতে পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে। তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই লোকেরা প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পলাইতেছে।

"দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়,
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়।
ক্ষণে দুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে,
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ করুণার্দ্র-হৃদয়ে পথের লোকদিগকে এই দুই জনের নাম, ধাম ও জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "কি বলিব গোসাঞি! এই নবদ্বীপেই ইহাদিগের বাস। দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠের নাম মাধব, আর কনিষ্ঠের নাম জগন্নাথ। অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম। বাল্যকালেই কুসঙ্গে পড়িয়া সুরাপানাসক্ত হয়। আর এখন ত এই অবস্থা। ইহারা না করিয়াছে, এমন পাপ নাই। চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, পরের ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া, নরহত্যা, ব্যভিচার ও গোমাংসভক্ষণ, এ সমস্ত ইহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম।"

"সে দুই জনার কথা কহিতে অপার,
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস ভক্ষণ,
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হরিনাম প্রচার করা যার তার কর্ম্ম নয়। এ কার্য্যের জন্য জীবের দুঃখে কাতর মহাপ্রাণ শক্তিমান্ ব্যক্তির প্রয়োজন। এ নিমিত্ত তিনি মহাশক্তিধর করুণার সাগর নিতাইচাঁদকে জীবের কাণে নাম শুনাইতে পাঠাইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দিলেন, বারংবার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আমাদের হরিদাস ঠাকুরকে। জগাই-মাধাইয়ের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ করিয়া নিত্যানন্দের দয়ার্দ্র প্রাণ একান্ত বিচলিত হইল। তিনি করুণা-কাতর অন্তরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই দুই জনকে উদ্ধার করিতেই হইবে। আহা! ইহারা মদের নেশায় এখন যেমন আত্মহারা, যে দিন শ্রীকৃষ্ণের নামে তেমনি ধারা হইবে, আর যে দিন আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নামে কাঁদিয়া সারা হইবে, সেই দিন জানিব যে, আমার সমস্ত পর্য্যটন সার্থক হইল। যাহারা ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে সদ্যঃ যাইয়া গঙ্গাস্নান করে, তাহারা যদি এই দুই জনকে দেখিয়া গঙ্গাস্নানতুল্য জ্ঞান না করে, তবে আমি নিত্যানন্দ নাম বৃথাই ধারণ করি।"

নিত্যানন্দ মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে হরিদাসঠাকুরকে কহিলেন—"দেখ হরিদাস! ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ইহাদের কি দুর্গতি! যদি তোমার কৃপা হয়, তবেই এই দুইটি জীব উদ্ধার পায়। যবনেরা তোমাকে প্রাণান্ত করিয়া প্রহার করিল, তথাপি তুমি তাহাদিগের কুশলকামনাই করিয়াছিলে। তুমি যদি ইহাদের একটু শুভানুসন্ধান কর, তবেই ইহারা তরিয়া যায়।"

"প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে,
তাহারও করিলে তুমি ভাল মনে মনে।
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে,
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাসঠাকুর নিত্যানন্দপ্রভুকে ভালরূপেই জানিতেন। এ সকল কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এই দুই জনের উদ্ধার হইতে আর বিলম্ব নাই। তাই বলিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি আমাকে মিছা ছলনা করিতেছ কেন? স্বয়ং তুমি যাহাদের উদ্ধার চিন্তা কর, তাহারা ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। আর, আমার জানিতে বাকী নাই যে, তোমার যে ইচ্ছা, মহাপ্রভুরও সেই ইচ্ছা।"

তখন নিত্যানন্দ হাস্যপূর্ব্বক হরিদাসঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, যাক্ সে কথা। তবে এস, দুই জনে উহাদিগের কাছে যাইয়া কৃষ্ণনাম শুনাই। প্রভুর আজ্ঞা এই যে, অবিচারে সকলকে কৃষ্ণনাম বিলাইতে হইবে, বিশেষতঃ পাপিতাপীকে। আমাদিগের উপর শুধু বলিবার ভার, আমরা বলিয়াই মুক্ত। যদি উহারা আমাদের কথায় কৃষ্ণ না বলে, কৃষ্ণ না ভজে, তবে সে কথা প্রভু বুঝিবেন।"

"সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ,
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ।
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার,
বলিলে না লয় যবে সেই ভার তাঁর।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

অতঃপর দুই জনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে জগাই-মাধাইয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাস্তার লোকেরা তাঁহাদিগকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল—"তোমরা বিদেশী সাধু, ইহাদিগকে চিন না। ইহারা ঠাকুর-দেবতা, সাধু-সজ্জন কিছুই মানে না। তোমরা সাধু বলিয়া যে উহারা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে করিও না; জগাই-মাধাই তেমন পাত্রই নয়। তোমরা উহাদের নিকট যাইও না, বিপদে পড়িবে।" তাহারা হিত-কথাই বলিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর আজ্ঞা যে, অবিচারে সকলকে কৃষ্ণনাম শুনাইতে হইবে। সুতরাং দুই সাধু যাইতে যাইতে জগাই-মাধাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই নেশার ঝোঁকে অন্যমনস্ক থাকাতে এতক্ষণ নিত্যানন্দ-হরিদাসকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মুখের ঐ সকল শব্দ শুনিবামাত্র মাথা তুলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখে যে, দুই জন সন্ন্যাসী বড় গলায় কৃষ্ণনাম লইতেছে। আর কি রক্ষা আছে? রাঙ্গা কাপড় দেখিলে যেমন মহিষ ক্ষেপে, সেইরূপ দুই ষণ্ডামার্ক ক্ষেপিয়া ধর্ ধর্ বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এমনি তাড়া করিয়া আসিল যে, তাঁহারা ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছেন, জগাই-মাধাইও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এই ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। সেই দুই জনের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! রক্ত-জবার মতন চক্ষু, আর অসুরের ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও ধূলিধূসরিত। ভাগ্যে দুই জনই স্থূলকায়, দ্রুত দৌড়াইতে অক্ষম, বিশেষতঃ সুরার প্রভাবে টলটলায়মান, তাই রক্ষা। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছুটিতেছেন আর এক একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। হরিদাস নিতাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছেন, "আর ত আমি চলিতে পারিতেছি না। সেবারে যবনের হস্ত হইতে কোনও প্রকারে প্রাণটা লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিলাম। আজ এই চঞ্চলের বুদ্ধিতে আসিয়া বুঝি বা তাহা হারাইলাম।"

নিতাই বলিলেন—"বেশ, বিলক্ষণ। আমি হইলাম চঞ্চল! তোমার প্রভুটির দোষ তুমি কিছুই দেখ না। হুঁ, ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজার ন্যায় আদেশ জারি করেন। তাঁর আজ্ঞা না শুনিলেও দোষ, আর উহা পালন করিতে গেলে ত এই লাভ! তার পর লোকে চোর, চণ্ড্ ছাড়া বলে না। তুমি ত বেশ আমাকে দূষিতেছ। দুই জনে গিয়া উহাদের কাছে প্রভুর আজ্ঞা বলিলাম, আর দোষী হইলাম একলা আমি!"

"আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি,
দুই জনে বলিলাম, দোষভাগী আমি।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

উভয়ে পরম কৌতুকে এইরূপ প্রেমকোন্দল করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন যে, দস্যুদ্বয় বহুদূরে রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের লাগ না পাইয়া এখন নিজেরাই হুড়াহুড়ি করিতেছে। নিত্যানন্দ-হরিদাসের ধড়ে প্রাণ আসিল। তাঁহারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া পরস্পর প্রেমে কোলাকুলি করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছিলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাস আসিয়া অদ্যকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস আচার্য্য জগাই-মাধাইয়ের চরিত্র বিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহারা উহাদের সমস্ত কুচেষ্টার কথা মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভো! আমার এক নিবেদন আছে। আমার সোজা কথা। তুমি যদি এই দুই জনকে উদ্ধার না কর, তবে ইহারা থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। যাঁহারা স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, তাঁহাদিগকে হরিনামে নাচাইতে, কাঁদাইতে, মাতাইতে কে না পারে? তাহাতে একটা গৌরব কি? যদি তুমি এই দুই মাতালকে হরিনামে উদ্ধার করিয়া হরিপ্রেমে কাঁদাইতে পার, তবেই বুঝিব তোমার মহিমা।"

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ! বুঝিলাম, কৃষ্ণ অচিরেই উহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। যখন উহারা তোমার দর্শন পাইয়াছে, বিশেষতঃ তুমি উহাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছ, তখন সেই দুই জনের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।"

"হাসি বলে বিশ্বম্ভর পাইবে উদ্ধার,
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল,
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাসঠাকুর একটু দূরে যাইয়া অদ্বৈত প্রভুর কাছে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ প্রভু, মহাপ্রভুর কি রকম চমৎকার ব্যবস্থা! আমাকে এই চঞ্চলের সঙ্গে নিত্য পাঠাইয়া দেন। আমি যদি যাই উত্তরে, তিনি চলেন দক্ষিণে। গঙ্গার দিকে গেলেই একবার জলে নামিয়া সাঁতার দেওয়া চাই। গঙ্গায় কুমীর ভাসিতেছে দেখিয়া তিনি সাঁতার কাটিয়া তাহাকে ধরিতে যান, আমি তীরে থাকিয়া কেবল ডাক পাড়ি আর হায় হায় করি, একবার ফিরিয়াও চাহেন না। এইরূপ তাঁর লীলা। রাস্তায় ছোট বালক-বালিকা দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখান এবং যেন আক্রোশ করিয়া মরিবার জন্য তাহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকেন। ফলে শিশুদের পিতামাতা হাতে ঠেঙ্গা লইয়া ঠাকুরকে মারিতে আইসে। আমি তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া নিরস্ত করিয়া পাঠাই। কত বা বলিব; গোয়ালারা রাস্তা দিয়া যায়, আর এই ঠাকুরটি গিয়া তাহাদের ঘৃত-দধি লইয়া একবারে লম্বা দৌড়! তাঁহার নাগাল না পাইয়া উহারা আমাকেই আসিয়া ধরে। মাঠে পরের গাবী চরিতেছে, তিনি যাইয়া তাহার বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কখন বা একটা ষাঁড়ের পিঠেই চড়িয়া বসিলেন। সে বেচারি শিঙ্ নাড়িয়া লম্ফে-ঝম্পে ছুটিল, আর তিনি তার পিঠের উপরে থাকিয়া পা দোলাইয়া বলিতে লাগিলেন—'এই দেখ্, আমি মহাদেব।'

এই ত তাঁর কীর্ত্তি। তার পর, আমি যদি একটু বুঝাইতে যাই, তবে আমাকে যাহা বলিবার, তাহা ত বলেনই, অধিকন্তু তোমাকে গালি দিয়া বলেন—'তোমায় অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? আর তুমি যারে মহাপ্রভু মহাপ্রভু বল, সেই চৈতন্যই বা আমার কি করিতে পারে?' আমি এ সকল কথা মনে মনে রাখি, কাহাকেও বলি না। ইঁহার বুদ্ধির দোষে আজ যে দুই মাতালের হাতে পড়িয়াছিলাম! তোমার কৃপা ছিল, তাই ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ লইয়া আসিয়াছি।"

ভঙ্গী করিয়া কথা বলিতে শ্রীঅদ্বৈতও কম পাত্র ছিলেন না। তিনি হরিদাসঠাকুরের ব্যাজস্তুতি শুনিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—"মাতালকে নাম শুনাইতে গিয়াছিলেন, উপযুক্তই হইয়াছে। মদ্যপের সহিত মদ্যপের সঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক। ইনি যেমন মাতাল, তেমনি গিয়াছিলেন আর দুই মাতালের সঙ্গ করিতে। কিন্তু, হরিদাস! তুমি নৈষ্ঠিক হইয়া সেই সঙ্গে গেলে কেন? আমি এই নিত্যানন্দের চরিত্র ভালরূপই জানি। দেখিবে, দু'দিন পরে এই দুই জনকে লইয়া নিমাই নিতাই একত্রে নাচিবেন। সব একাকার হইতে আর বিলম্ব নাই। চল, এই বেলা তুমি আর আমি জাতি লইয়া পলাই।"

"দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া,
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া।

একাকার করিবেক এই দুই জনে,
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কিছু দিন পরে জগাই-মাধাই, যে পথে মহাপ্রভু নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া আড্ডা করিল। সে স্থান মহাপ্রভুর বাটী হইতে বেশী দূর নয়। সকলে তটস্থ। উহাদের ভয়ে সন্ধ্যার পর কেহ ঘরের বাহির হন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন রাত্রিকালে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া কীর্ত্তন করেন, তখন উহারা বাড়ীর বাহিরে থাকিয়া কীর্ত্তন শুনে, আর নেশার ঝোঁকে মৃদঙ্গ-করতালের তালে তালে নাচে, আর হৈ হৈ করে। মহাপ্রভু যখন প্রাতে গঙ্গাস্নানে যান, তখন জগাই-মাধাই তাঁহার নিকট যাইয়া বলে—"ওহে নিমাই পণ্ডিত! বেশ ত গানের দল করিয়াছ! বলিয়া রাখিলাম, একদিন আমাদের বাড়ী যাইয়া একপালা মঙ্গলচণ্ডীর গান গাইতে হইবে। কিন্তু গায়েন-গুলা ভাল হওয়া চাই। আর যাহা যাহা দরকার, সে সব আমরা যেখানে পাই, আনিয়া যোগাড় করিয়া দিব।" মহাপ্রভু উহাদিগকে দেখিয়া একটু দূরে দূরে থাকিয়া চলিয়া যান।

একদিন নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া, বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই, রাত্রিকালে সেই পথ দিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীতে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা। আজ হরিদাস ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন না, নিতাই একলা। জগাই-মাধাই নিত্যানন্দের সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া বলিল—"তুমি কে?" নিতাই বলিলেন—"আমার নাম অবধূত।" নিত্যানন্দের কথা শেষ হইতে না হইতেই "আরে, সে দিনকার সে বেটা রে, সে বেটা" বলিয়াই মাধাই একটা ভাঙ্গা কলসীর কান্ধা মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দের কপালে ছুড়িয়া মারিল। দরদরধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ নিতাইচাঁদ উহাদিগকে উদ্ধার করিতেই আসিয়াছেন, মার খাইয়াও প্রেম বিলাইবেন বলিয়াই আসিয়াছেন। প্রেমে বিহ্বল নিত্যানন্দ সেই কঠোর আঘাতকে পুষ্পাঘাত তুল্য জ্ঞান করিলেন, এবং আপনার শত্রুকে কোল দিবার জন্য বাহু প্রসারিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

"মাধাই রে! মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা,
ওরে, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

"আয় ভাই! বুকে আয়! একবার মেরেছিস, না হয় আবার মার্, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ মুখে একটিবার হরি বল্। তোদের মুখে হরিবোল শুনিবার জন্য আমি বহু দূর হইতে আসিয়াছি। তোরা দুভাই হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া নে। হরি ভজিলে, আমি বিনামূলে তোদের কাছে বিকাইব।"

মানুষ না দেবতা? ইহা কি মানুষে পারে? এমন দারুণ প্রহারেও নিতাইয়ের বদন প্রসন্ন, নয়নে করুণার ধারা। আর শত্রুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য পরিসর-বক্ষ অগ্রসর ও ভুজদ্বয় প্রসারিত, মুখে হরিনাম! পাঠক, একবার চাহিয়া দেখ—করুণার সাগর নিতাইচাঁদকে দেখ, সর্ব্বাঙ্গে যেন করুণার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। মরি মরি! কি দুর্লভ দর্শন। নিত্যানন্দের শরীর বুঝিবা রক্তমাংসের শরীর নহে। কেমন করুণামাখা স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের করুণারাশি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আজ নদীয়ার রাজপথে অবতীর্ণ! অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই চক্ষের জলে ভাসিয়া, করুণা-কাতর দৃষ্টিতে জগাই-মাধাইয়ের পানে চাহিয়া আবার বলিলেন,—

"ভাই রে!
বল কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।"

নিতাইয়ের প্রেমে একটি পাষাণ গলিল—জগায়ের প্রাণ দ্রব হইল। মাধাই পুনর্ব্বার কলসীর কানা তুলিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং বলিল—"মাধাই! এই দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মারিয়া কি লাভ? চাহিয়া দেখ, ইহাঁর অঙ্গে রক্তের ধারা বহিতেছে, তথাপি হাসিমুখে হরি নাম করিতেছেন! দেখ, দেখ, আমাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া আছেন! আহা! হরি নাম যে এত মধুর, তাহা ত ভাই আগে জানি নাই। আয় ভাই! আমরাও হরি বলি। কলসীর কান্ধা ফেলিয়া দে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকমুখে নিত্যানন্দের বিপদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের দেহে শোণিত-পাত দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'চক্র চক্র' বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। মহতের অতিক্রম, ভক্তের গ্লানি তিনি কেমন করিয়া সহিবেন? তাই সুদর্শন-চক্রকে স্মরণ করিলেন। প্রেম-দাতার শিরোমণি নিতাই তাহা দেখিয়া বলিলেন—"ও কি কর প্রভু? আমার কথা শুন, আমার কথা শুন। এই জগাইয়ের কোনও দোষ নাই। মাধাই দ্বিতীয়বার মারিতে উদ্যত হইলে জগাই আমাকে তাহা হইতে প্রাণে রক্ষা করিয়াছে। দৈবে একটু রক্ত পড়িয়াছে, কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই। প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও, ইহাদিগকে ক্ষমা কর। এই দুই জনের শরীর আমাকে ভিক্ষা দাও।"

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। জগাই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া, মহাপ্রভু জগাইকে ধরিয়া কোল দিলেন, এবং বলিলেন—"জগাই রে! আজ নিত্যানন্দের প্রাণ রাখিয়া তুই আমাকে কিনিয়া নিলি। কৃষ্ণ তোর কুশল করুন। আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোর প্রেমভক্তি লাভ হউক।"

"জগায়েরে বলেন কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে,
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলে তুই মোরে।
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ,
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাইয়ের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তমণ্ডলী হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাইকে কিছু কাল বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তিসঞ্চারী স্পর্শ জগাই সহ্য করিতে পারিল না, তাঁহার শক্তি সে ধারণ করিতে পারিল না। জগাই সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় মহাপ্রভুর কোল হইতে খসিয়া তাঁহার চরণমূলে পতিত হইল। পরে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া কাঁদিয়া লোটাপুটি করিতে লাগিল। আহা! কি ভাগ্য! মহাপ্রভুর কি দয়া! স্পর্শমণির ধর্ম্ম এই যে, সে স্পর্শ করিবামাত্র লৌহ স্বর্ণ হয়। স্পর্শমণি লৌহের ভাল মন্দ বাছে না। লৌহ নরহত্যা করিয়া নরশোণিতে কলঙ্কিতই হউক, কিংবা ঠাকুর-সেবার কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকুক, যাহাই হউক না কেন, একবার পরশ-মণির পরশ পাইলেই সে খাঁটি সোণা! আজ আমাদের গৌরাঙ্গ-পরশমণির স্পর্শে জগাই খাঁটি সোণা হইয়া গেল।

মাধাই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। জগাইয়ের পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিল। মাধাই এক অচিন্তনীয় শক্তিতে অবশ হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "দোহাই প্রভু, আমাকে কৃপা কর। আমরা জগাই-মাধাই দুই ভাই চিরকাল এক সঙ্গে পাপ করিয়াছি। আজ জগাই তরিয়া গেল, আর আমি একলা পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুর! আমাকেও কৃপা করিতে হইবে, আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম।"

"দুই জনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ,
অনুগ্রহ কেন প্রভু কর দুই ভাগ।"

মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমাকে কৃপা করিবার শক্তি আমার নাই। তুমি নিত্যা-নন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়া তাঁহার স্থানেই অপরাধ করিয়াছ। তাঁহার চরণে গিয়া পড়। যদি তিনি কৃপা করেন, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে, নতুবা উদ্ধার নাই।"

মাধাই যাইয়া নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া পড়িল।

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন,
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই-চরণ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি করুণার সাগর। মাধাই তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিল। ইহাকে তুমি কৃপা কর।" নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভো! কেন আর ছলনা করিতেছ? ইহাকে উদ্ধার করিয়া লও। আমি ত ইহার অপরাধ পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি যে, কোন জন্মে যদি আমার কিছুমাত্র সুকৃতি থাকে, তবে তাহা আমি মাধাইকে দিলাম। ইহার সমস্ত অপরাধ আমি লইলাম। তুমি ছলনা ছাড়িয়া ইহাকে কৃপা কর।"

মহাপ্রভু বলিলেন- "শ্রীপাদ! যদি ইহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলে, তবে এক্ষণে আলিঙ্গনদানে ইহাকে কৃতার্থ কর।"

অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই মাধাইকে হৃদয়ে ধরিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সকল বন্ধন মোচন হইল। ভক্তেরা দেখিলেন যে, মাধাই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত হইল!

"মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা,
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মাধাই হইলা।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই দুই ভাই গৌর-নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিয়া অনুতাপসহকারে কাঁদিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জগাই-মাধাই! অদ্য-হইতে তোমরা দুই ভাই নিষ্পাপ হইলে। তোমরা যদি পুনরায় পাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদিগের জন্মজন্মান্তরের যত পাপ আছে, যে সমস্তের ভার আমি গ্রহণ করিলাম। আর ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন কর। অদ্য হইতে আমি তোমাদের মুখে আহার করিব এবং তোমাদিগের দুইজনের দেহে আমি বিরাজ করিব।"

"কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর,
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর।
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার,
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই মহাপ্রভুর আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া, তাঁহার এমন কৃপা দেখিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "এখন এই দুইজনকে তুলিয়া লইয়া চল। গৃহে যাইয়া ইহাদিগকে লইয়া আজ মহাকীর্ত্তন করিব, এবং ইহাদিগকে

জগতের উত্তম করিয়া লইব। এখন ইহাদের স্পর্শমাত্র যাহারা গঙ্গাস্নান করে, অতঃপর তাহারা এই দুই জনের স্পর্শ গঙ্গাস্নানতুল্য জ্ঞান করিবে।"

"এই দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান,
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে অচেতন অবস্থায় ধরাধরি করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভুকে বেষ্টন করিয়া শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, গদাধর, গঙ্গাদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ, বাসুদেব ও মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মহাসভা মিলাইয়া বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে জগাই-মাধাই সংজ্ঞালাভ করিলে, মহাপ্রভু সকলকে বলিলেন—"ইহারা দুই জন তোমাদিগের যার যার কাছে যে যে অপরাধ করিয়াছে, তৎসমুদয় তোমরা ক্ষমা কর।" দুই ভাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া একে একে সকলের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তগণ তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—"ভক্তগণ! তোমরা অতঃপর এই দুই জনকে আর পাপী জ্ঞান করিও না। অদ্যাবধি ইহারা নিষ্পাপ হইল। জানিও, ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করিলে আমাকেই শ্রদ্ধা করা হইবে। এক্ষণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর।"

অদ্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইতে না হইতেই মহাপ্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন। সকলের উচ্ছ্বাসপূর্ণ হরিধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ হইল। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বর প্রভৃতি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আজ গৌরভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা নাই। সকলেই নাচিতেছেন, সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর নাচিতেছেন—জগাই-মাধাই দুই ভাই। তাঁহাদিগের প্রাণের ভিতরে আজ এক নূতন আনন্দময় রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। উভয়ে নাচিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল বলিতেছেন, আর দুনয়নে যেন সুরধুনী বহিয়া যাইতেছে। দুরন্ত জগাই-মাধাই আজ হরিনামে হার মানিল। নিতাই-গৌরাঙ্গের প্রভাব দেখিয়া পণ্ডিতের নবদ্বীপ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল!

"দুরন্ত সেই জগাই-মাধাই হার মেনেছে হরিনামে,
হরি হরি ব'লে ভাসিতেছে গৌরপ্রেমে।"

হরিদাস ঠাকুর যত দিন নবদ্বীপে ছিলেন, তত দিন তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিতেন। কারণ, উহা শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ। মহাপ্রভুর হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যেও তাঁহার ভক্তিবিলসিত উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। কিন্তু এখানে তিনি নিজে প্রধান হইয়া কিছুই করেন নাই। এজন্য এ সময়ে তাঁহার জীবনের তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। নবদ্বীপে তাঁহার নিজের কিছুই করিবার

ছিল না। যাহা কিছু করিয়াছেন, মহাপ্রভুর আজ্ঞাধীন হইয়া। তিনি কেবল চক্ষু ভরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা দর্শন করিতেন, আর প্রাণ ভরিয়া তাহা সম্ভোগ করিতেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলারসে তিনি আপনার ব্যক্তিত্ব একবারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

বিনয়, সৌজন্য ও তৃণাদপি সুনীচের ভাবটা হরিদাসঠাকুরের সারা জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ভক্তগণ ও প্রভু তিন জন তাঁহাকে কত মর্য্যাদা দিতেন ও কত আদর করিতেন। কিন্তু তাহাতে তিনি আরও জড়সড় হইয়া থাকিতেন। কিসে কখন্ কাহার মর্য্যাদাভঙ্গ হয়, এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা তটস্থ থাকিতেন। মহাপ্রভু দণ্ডে দণ্ডেই হরিদাস ঠাকুরের খবর লইতেন। প্রভু আহারে যাইতেছেন, তখন "হরিদাস কোথায়" বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু হরিদাস একান্ত কাতরতার সহিত বলিলেন যে, তিনি অধম, সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে যোগ্য নহেন। সকলের আহারান্তে বাহিরে বসিয়া এক মুষ্টি প্রসাদ পাইবেন।

"হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম,
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

যেরূপে হরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মে, তাহার লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বিখ্যাত 'তৃণাদপি' শ্লোকে বলিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর যেন সেই শ্লোকোক্ত লক্ষণসমষ্টির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। শ্লোকটি এই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পয়ারে ইহার সুন্দর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম,
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়,
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন,
ধর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ।
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান,
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়,
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

ইংরাজী শিক্ষা, স্বাদেশিকতা ও স্বাধীন চিন্তা *

সম্পাদক মহাশয় এইমাত্র পুস্তকালয়ের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে যে বিবরণী আপনাদের সমক্ষে পাঠ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পুস্তকালয়ের সাফল্যের জন্য আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। অদ্য অপরাহ্ণে আপনারা আমাকে এই সভার সভাপতিপদে নিয়োগ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ডাক্তার শীল মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমি তাঁহার ও আপনাদের সকলেরই নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ বাগ্মিগণ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, আমি রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রকাশার্থ কৃতজ্ঞহৃদয়ে সেই সকল বক্তৃতায় মাত্র কয়েকটি কথা যোগ করিয়া দিব। ইতিপূর্ব্বে আমি যে স্তোত্রটি পাঠ করিয়াছি, তাহা "স্তাবকতার একমুষ্টি পুষ্প মাত্র।" এখন আমি যে কয়েকটি কথা বলিব, তাহা সেরূপ নহে। যদিও রাজা রামমোহন মহাপুরুষ, কিন্তু অতিশয়োক্তি কখনও কাহারও প্রকৃত সম্মানের কারণ হইতে পারে না। ডাক্তার শীল মহোদয় রাজার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে যে মতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলিব না। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কি মত ছিল, সম্ভবতঃ কেহই তাহা যথার্থরূপে জ্ঞাত নহেন। বোধ হয়, রাজাও সে সম্বন্ধে নিজে কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, কারণ, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট তিনি এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য দেশে কখনও তিনি আপনাকে বেদান্তবিদ্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কখনও তিনি পুরশ্চরণ করিতেন, আবার কখনও বা অন্যান্য তান্ত্রিকমতে সাধনও করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বামী হরিহরানন্দ ভারতীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাজা আপনার গুরু হরিহরানন্দকে আগম-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার অপরাপর চরিতকারগণ যে ভাবে রাজার জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে, রামমোহন বেহ্মামধর্ম্মমতাবলম্বী অস্পষ্ট ঈশ্বরবাদী। একপ্রকার রেশমী বস্ত্র আছে, স্থান ও আলোকের প্রভেদবশতঃ তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রাম-মোহনও সেইরূপ ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসীর নিকট তিনি তাঁহাদেরই মতানুবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

---

* রামমোহন পুস্তকাগারের দশম বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্যার উড্রফ্ মহোদয়ের অভিভাষণ।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এক এক শ্রেণীর এরূপ লোক দৃষ্ট হয় যে, তাহারা তোমাকে স্বদলভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া লয়। ইহার হেতু এই যে, তুমি হয় ত তাহাদের ধর্ম্মমতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুদ্ধির দ্বারা যথার্থই আয়ত্ত করিতে পার এবং সে কথা অন্তরের সহিত প্রতিপন্ন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ কর না। কিন্তু এই প্রকার উভয়বিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। আমার মতে রাজা রামমোহন পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু ভাল বলিয়া তাঁহার কাছে বিবেচিত হইয়াছিল, স্বদেশবাসীকে শুধু সেইটুকুই গ্রহণ করাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার মত যথার্থ ও সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিষয়ে আমি কোন কথাই বলিব না। কারণ, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবেই। তিনি যাহাই হউন না কেন, রাজা যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং একজন সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মহাত্মা রামকৃষ্ণের মত তিনি সিদ্ধ হইতে পারেন নাই।

মানুষ যে কাজ নিজে করে, তাহার সম্বন্ধে সে দৃঢ়তার সহিত নিজের মতও বলিতে পারে। আমার মনে হয়, (যদিও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন)। রাজা যত বড় দার্শনিক এবং ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি তদপেক্ষা অনেক বড় স্বদেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষাপ্রচারের জন্য তিনিই একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পৃথিবীতে সকল বিষয়েরই দুইটা দিক্ আছে, একটা ভাল, অপরটি মন্দ। ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষা-প্রচলনেও সেইরূপ দুইটি ফল ফলিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে যে, সকল প্রকার শুভ কার্য্যেই শয়তান তাহার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লয়। যাহা হউক, আমার মনে হয়, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে নিজ দেশের জ্ঞানের সঙ্গে বৈদেশিক জ্ঞানের যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাহাই পরিপাক করিবার জন্য বলিতেন। গত বৎসর জনৈক তরুণবয়স্ক বাঙ্গালীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল. তাঁহার এইরূপ ধারণা যে, বাঙ্গালী জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া কখনও দাঁড়াইতে পারিবে না। সেই দুঃখে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া অন্য জাতির সহিত মিশিয়া গেলেই ভাল হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন এরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালী ছিলেন না। আমার নিজেরও ব্যক্তিগত মত এই যে, কোনও জাতি অন্য জাতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপনার অস্তিত্ব যেন হারাইয়া না ফেলে। আমি নিজে তাহা কখনও পছন্দ করি না। এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ রাজা হয় ত আমাদিগকে এইরূপ বলিতেন। (তিনি নিজে না বলিলেও, আমরা তাঁহার হইয়া বলিতেছি) "যাহা তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ, প্রয়োজনীয়, তাহা গ্রহণ কর।" আমার ত ধারণা হয় না যে, তিনি কোথাও এমন কথা বলিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় লোক অন্যের ধার-করা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিচ্ছদে আপনাদের দেহ আচ্ছাদিত করুক।

এই বিচিত্র, সুন্দর বিশ্বে প্রত্যেক জাতির পক্ষে যথেষ্ট স্থান আছে, এখানে সকলেই নিজ নিজ স্বাধীন ধর্ম্মমত, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও নীতিজ্ঞান লইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং সেই ভাবে থাকাই প্রয়োজন।

স্বদেশপ্রেম বলিতে অধুনা যাহা বুঝায়, রাজা সেই শ্রেণীর প্রথম ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। স্বদেশপ্রেম ইদানীং যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। "বিধিবদ্ধ আন্দোলনেও" সে যুগের লোক বুঝিত না। রাজা রামমোহন এতদুভয়েরই জনক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত অধ্যাত্মবাদী ভারত-বাসী ব্যক্তিগত স্বার্থকে চাপিয়া রাখিতেন, জাতির স্বার্থও তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যাপার ছিল। শ্রীভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া হয় ত তিনি আপনাকে সৌভাগ্য-বান্ বলিয়া মনে করিতে পারেন, এবং প্রকৃত কর্ম্মযোগীর ন্যায় নিষ্কামভাবে জন্মভূমির সেবা করিতে পারেন; কিন্তু বিশ্ব-আত্মা ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী প্রাচীন হিন্দু কথনও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিষ্যমণ্ডলীর ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী বর্ত্তমান দেহের জন্য আপনাকে প্রবৃত্তির প্রগাঢ়ভাবের ধারায় প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন। তিনি জানেন, পরজন্মে হয় ত তাঁহাকে ভিন্ন জাতির মধ্যে, ভিন্নদেশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্মই শেষ নহে। এমন কত জন্ম তাঁহার হইয়াছে, আবার কত জন্ম হইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাজা এই ব্যাপারেও অতীত এবং বর্ত্তমানের মধ্যবর্ত্তী পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, তিনি সর্ব্বজাতির সৌভাগ্যে সমভাবে আনন্দানুভব করিতেন এবং নিজের জাতি সম্বন্ধে বৃথা গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা হইতে বিমুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কল্পনাই এই ছিল যে, তাঁহার দেশের লোক পাশ্চাত্য জাতির আদর্শে রাজনীতিক সুবিধা এবং সামা-জিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া সুখে, আনন্দে ও শান্তিতে যেন কালযাপন করিতে পারে।

নির্ভীক বীরের ন্যায় রাজা দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং উৎপীড়িতের প্রতি করুণ ছিলেন। নারী-জাতির রক্ষাকল্পে, সতীদাহরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রাজা রাম-মোহন যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, আমার কাছে তাহার সকলগুলির অপেক্ষা এই কার্য্যই মহত্তর।

তাঁহার একখানি পত্র পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে, রাজনীতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতার পথ প্রশস্ততর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত রুচি এবং বিবেচনার যে কোন মূল্য নাই, তাহা নহে; কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্তিগত রুচি পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এখানে সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি।

কোনও সাধুর একটি পোষা বিড়াল ছিল। সাধু এই মার্জ্জারটিকে স্নেহ করিতেন,

সেও প্রভুর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। সাধুর দেহে নিজ অঙ্গবর্ষণ করিয়া বিড়াল তাহার আনুরক্তি এবং আনন্দ প্রকাশ করিত। সাধনসময়ে পাছে সে তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করে, এই জন্য তিনি তাহাকেও সে সময়ে বাঁধিয়া রাখিতেন। সাধুর শিষ্যগণ সাধন-ভজনের সময় গুরুর দেখাদেখি মার্জ্জারটিকে বাঁধিয়া রাখিত। অবশ্য, সে তাঁহাদিগকে আদৌ বিরক্ত করিত না। কিন্তু গুরু বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখেন দেখিয়া তাঁহারাও বাঁধিয়া রাখিতেন। এই সকল শিষ্য যখন গুরু হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের শিষ্যগণ সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু একটা করিয়া মার্জ্জার বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিতেন না।

রাজা রামমোহন দেখিলেন, তিনি যে যুগে জন্মিয়াছেন, সে সময়ের লোক "বিড়াল বাঁধার" পদ্ধতিটা অতিমাত্রায় পালন করিতেছে। নিষ্প্রয়োজনে "বিড়াল-বন্ধন"রূপ ব্যবস্থার যতটুকু সংস্রব, তাহাতে বিড়ালের মুক্তিদানে কেহই রামমোহনের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোনও ধর্ম্মবিশ্বাস এবং পদ্ধতি কলুষিত হইলেও, সেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারকে দোষমুক্ত করিয়া অবলম্বন করা বিধেয়, না একেবারে তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ? এই প্রশ্ন উঠিতেছে বলিয়াই যাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী এবং গোঁড়া, তাঁহারা বলিবেন, রাজা এ বিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি করিয়া গিয়াছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও আমি এ প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি না। প্রাচীন পদ্ধতিতে সকল প্রকার লোকের জন্যই ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনা যায়। এ বিষয়ে আমি একটি চীনদেশীয় রূপক আপনাদিগকে শুনাইব। সেই উপাখ্যানে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে এক প্রকার ব্যবস্থা করিলে কিরূপ বিপদ্ ঘটিতে পারে। গল্পটি এইরূপ :—

দক্ষিণ-সমুদ্রের রাজা ছিলেন সু। হু উত্তর-সমুদ্রের অধিপতি। "মধ্যস্থলের" রাজার নাম কেয়স। হু এবং সু প্রায়ই কেয়সের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। সু এবং হু পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কেয়সের এই মধুর ব্যবহারের প্রতিদান কি উপায়ে দেওয়া যায় ? তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিয়া বলিলেন, "দর্শন, শ্রবণ, ভোজন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মানুষের সাতটি রন্ধ্র বা দ্বার আছে, কিন্তু এই রাজার উহার একটিও নাই। অতএব এস, আমরা তাহার সপ্ত রন্ধ্রের ব্যবস্থা করিয়া দেই।" এইরূপ পরামর্শের ফলে তাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার অঙ্গে এক একটি ছিদ্র করিয়া দিলেন। সপ্তম দিবসে কেয়স্ মরিয়া গেলেন। হতভাগ্য কেয়স্! আজ যদি তিনি তাঁহার স্বাভাবিক, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতেন, তবে তিনি অনন্তকাল সুখে ও তৃপ্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন। তাঁহার প্রতিবেশীরা যদি অনধিকারচর্চ্চা না করিতেন, অনাবশ্যক উপকারের জন্য

বদ্ধপরিকর না হইতেন, তবে অকালে কেয়সের দেহত্যাগ ঘটিত না। অবশ্য, কেয়সের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে কেয়স্ অনন্তকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এই রূপকের দ্বারা আংশিক সত্যের প্রচার হয় বটে, কিন্তু তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে সমগ্র প্রকৃতি তাহাতে প্রতিফলিত হয়। আর প্রকৃতিতে সকলের জন্যই স্থান আছে। যে ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তিনিও প্রকৃতির ন্যায় সকলেরই জন্য থাকেন। কারণ, যদিও তাঁহার জ্ঞান কোন এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির জন্য উৎসাহ প্রকাশ করে, তিনি অপরকেও সোজাপথে চলিবার জন্য যত্ন সহকারে সতর্ক উপদেশ দিয়া থাকেন। যেহেতু, তিনি এটা বেশ জানেন, সার্থকতা না থাকিলে কোনও জিনিষ টিকিয়া যাইতে পারে না। কেহ হয় ত প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে কি আমাদের কোনও সংস্কারের প্রয়োজন নাই? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি ডাক্তার প্রভুদত্ত শাস্ত্রীর অভিভাষণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যখন বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর সংস্কার হইতেছে, তখন কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে সংস্কার আপনিই হইবে। কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যাহাতে প্রাকৃতিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বের স্বাভাবিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করেন, সেই জন্যই উক্ত গল্পের অবতারণা। প্রকৃতি হইতে যে সংস্কার ঘটে, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যে সংস্কার আপনা হইতেই হয়, তাহাই নির্দ্দোষ এবং ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য।

আমি যে সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিলাম, সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত মতের পার্থক্য থাকিলেও রাজার চরিত্রে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা আমরা একবাক্যে সকলেই প্রশংসা করিতে পারি। রাজা রামমোহন সকল বিষয়েই অভ্রান্ত ছিলেন কি না, তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, রাজা কতকগুলি কাজ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সর্ব্বান্তঃকরণেই তাহা পালন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা নিজে কেহই কিছু করি না, করিবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। সৎসাহস, আন্তরিকতা, কোমলতা এবং স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি স্বাধীন চিন্তা দ্বারা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা সকল কার্য্য শেষ করিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার উপর তিনি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। রাজা রামমোহন প্রাচীন যুগের মহাত্মগণের ন্যায় স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে স্বাধীন চিন্তার প্রসার কতদূরব্যাপী ছিল, তাহা অনেকেই জানেন না। চিন্তা দ্বারা তখন লোক মুনিত্বলাভ করিতেন। "মননাৎ মুনিরুচ্যতে।" যিনি স্বাধীন চিন্তাদ্বারা নিজের কোনও মতামত স্থির করিতে না পারিতেন, তিনি সেকালে মুনিপদবাচ্য হইতে পারিতেন না।

রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব তাঁহার অহঙ্কারের দ্যোতক নহে। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান

প্রচুরপরিমাণে ছিল। মানুষ হইলেই তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান থাকা উচিত। "পরোপকারো হি পরমো ধর্ম্মঃ" ইহাই রাজার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে কোনও বাঙ্গালী এই কথাটা তাঁহার মত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। শুধু এই কারণেই আমরা রাজা রামমোহনকে সম্মান করি।

শ্রীঃ——

——

সমালোচনা

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।—এ যুগের বাঙ্গলার গীতি-কবিতার একজন শ্রেষ্ঠ কবি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। বড়াল কবি ঠিক বার্দ্ধক্যে উপনীত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুকে আমরা অকাল-মৃত্যুই বলিব। ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য—বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য।

কবির মৃত্যুতে জাতির দুর্ভাগ্য লইয়া স্মৃতিসভা করা যায়, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখাও চলে। যদি সেই কবি ধনী হয়েন, বীর হয়েন, গর্ব্বোন্নতশির কর্ম্মী হয়েন, যদি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও ছবি জীবদ্দশাতেই তৈয়ার হইয়া গিয়া থাকে, তবে ত তাঁহার মৃত্যুতে একটা কেন, দশটা স্মৃতিসভা হইতে পারে। হাইকোর্টের জজ অথবা কোন মহারাজ পর্য্যন্ত সেই সভার সভাপতি হইতে পারেন। আর সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রের ছোট বড় স্তম্ভে একের পর আর শোকোচ্ছ্বাস ক্রমাগত বাহির করান যাইতে পারে। কিন্তু একটা মুস্কিল এই, সকলেই ধনী নয়, বীর নয়, কর্ম্মী নয়; এবং সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি ও ছবি থাকে না। আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাপের জমীদারী ন'ই। অধিকাংশেরই অবস্থা অসচ্ছল, সংসার আছে—কিন্তু একরূপ অচল। এইরূপ অসচ্ছল ও অচল অবস্থায় মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করিয়া, সুদীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া, ১০টায় ৫টায় অফিস করিয়া যাহাদিগকে সারাজীবন স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয়, এবং এত করিয়াও প্রবলের গ্রাস হইতে একমাত্র ভদ্রাসনখানি পর্য্যন্ত যাহাদের নিরাপদ্ নয়, সেই কলিকাতার কর্দ্দমাক্ত রাজপথের ঘর্ম্মাক্তকলেবর পথিক-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যদি কেহ দৈবাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় এবং পড়িয়া গিয়া মরিয়া যায়,তবে চলন্ত মোটর-কারের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাকাইয়া দেখিবার জন্য ধনী, বীর ও গর্ব্বোন্নতশির কর্ম্মী বাঙ্গালী, এই সহরে যে কত জন আছেন, তাহা আমরা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে মনে বেশ বুঝিতে পারি।

উন্মুক্ত রাজপথের অগণ্য যাত্রীদের মধ্য হইতে একজন নগণ্য কেরানীর মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির দুঃখ করিবার কি কারণ ঘটিল? কত তক্‌মাপরা সহিস্-কোচম্যান এই বিরলকেশ ভদ্রসন্তানটিকে অফিসের রাস্তায় কতদিন ফুটপাথের এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত করাইয়া অতি দ্রুত তাহাদের শকট চালাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় সাহিত্যের রথচালক তক্‌মা-পরা যাঁহারা, তাঁহারা কি সকলেই সহিস্-কোচম্যান? না হইলে কবির মৃত্যুকে তাঁহারা এমন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছেন কিরূপে? না হইলে

কবির মৃত্যুতে কবি কাঁদে না কেন? মাইকেল একদিন এই দেশেই মরিয়াছিল। বঙ্কিম কাঁদিয়াছে, হেম কাঁদিয়াছে, নবীন কাঁদিয়াছে। তাঁহারা স্ত্রীলোক বা বালক ছিলেন না, তবু তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া মাইকেলের জন্ম কাঁদিয়াছিলেন; কাঁদিয়া একটা গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ সে রেওয়াজ চলিয়া গেল কেন? যে দেশে ইঁদুর-বিড়াল মরিলে সভা হয়, কাঠবিড়ালী ঠক্-ঠক্ করিলে প্রতি-ধ্বনি উঠে, সে দেশে অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম শোক করিবার অবসর নাই?

বাঙ্গলায় পতঙ্গকুল আজিও প্রদীপ-শিখার আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে মিথ্যা মরীচিকা, বক্ষে আকণ্ঠ কপটতা, মুখে নির্জ্জলা ভণ্ডামী। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বাঙ্গালীর অনেক দোষের কথা আমরা শুনিয়া থাকি। কিন্তু সেকাল বা একাল কোন কালেই বাঙ্গালী যে নির্ব্বোধ ছিল, এমন অপবাদ অতিবড় শত্রুও দেয় নাই, বরং বলিয়াছে, বাঙ্গালী ধূর্ত্ত—অতিমাত্র ধূর্ত্ত। বাঙ্গালী ভাঁড়ু দত্তের বংশধর। এত বড় ধূর্ত্ত জাতি তাহার বিবেক হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধিকেও কি হারাইয়াছে? তাহা না হইলে একটা কবির মৃত্যুতে শুধু একজন কেরাণী মরিয়াছে ভাবিতে পারিল কিরূপে?

অক্ষয়কুমার বড়াল একজন কবি ছিলেন। তাহার প্রমাণ—বাঙ্গলায় অনেকগুলি গীতিকবিতার পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে সেই সমস্ত গীতি-কবিতার স্থান কোথায় এবং তিনি কোন্ শ্রেণীর কত বড় কবি, তাহা পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও এমন কি, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কবির কোন কোন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যথেষ্ট ভণিতা করা সত্ত্বেও বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীদের নিকট সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহা কবির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নয়। কবির প্রতি সমালোচকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। কেন না, বাঙ্গলায় সাহিত্যসেবা হয় সখ্, না হয় ব্যবসা। ইহা যে সাধনা, সে বোধ ত দূরের কথা, ইহার মধ্যে যে একটা দায়িত্ব আছে বা থাকিতে পারে, সেই জ্ঞানই বা কোথায়? খেয়াল হইল, দু'একখানা কাব্য পড়িয়া বা না পড়িয়া একটা ভূমিকা লিখিয়া দিলাম। আমি যে সমালোচক, তাহা ত দশজনে জানিল। আমি যে কেবল রাজনৈতিক নহি, সাহিত্যিকও বটি, তাহার ত পরিচয় দিলাম। বাস্, তার পর আবার কি?

আমরা কোন রজত-কাঞ্চনের ভারবাহীকে অক্ষয়কুমারের স্মৃতিসভার সভাপতি করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয় ত অক্ষয়কুমারের স্মৃতি-সভাই আমরা করি নাই। হয় ত এ ক্ষেত্রে আমাদের কপটতা অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তথাপি বাঙ্গলার সমাজে কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা বস্তু ছিল। জ্ঞানী গুণীর সম্মান করিবার একটা প্রথাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যখন সভা ছিল না, সংবাদপত্র ছিল না, তখনো আমরা মানুষ ছিলাম, আমাদের সে মনুষ্যত্ব আজ গেল কিসে? কবির প্রতি মমত্ববোধের

অভাবে জাতীয় চরিত্রের যে দুর্গতির চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই,—তাহা সত্যই ভয়াবহ।

জন্মভূমির দরিদ্র কবির মৃত্যুতে যে আমাদিগের শোক করিবার যথেষ্ট কারণ আছে,—তাহা ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর বড়াল কবি একটি অমর কবিতায় চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাসাহিত্য যত দিন আছে, তত দিন তাহা থাকিবে। কবির জীবদ্দশায় যশঃ কুড়াইবার জন্ম তাঁহার মধ্যে কেহ কোনরূপ অসুস্থ উত্তেজনা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কবির ক্ষেত্র যে সভাস্থল নয়, বুঝিয়া তিনি চিরদিন সন্তর্পণে সভা হইতে দূরে থাকিয়াছেন। একবার ৺কবি গোবিন্দদাসের একটি সাহায্য-সভায় তাঁহাকে আমরা লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কথা ছিল, তাঁহাকে কেহ বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে না। আমরা তাঁহাকে সে অনুরোধ করিতে ভরসা করি নাই। তিনি নিঃশব্দে সভার এক প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছিলেন, সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই আড়ম্বরহীন মাতৃভাষার একজন কৃতী সন্তান আজ মরণের পরপারে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, বাঙ্গলায় মানুষ নাই। এই কোমল শ্যামল নরম মাটীর যে একটা স্বধর্ম্ম ছিল, যে একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছিল,—তাহা নাই, চলিয়া গিয়াছে।

আজ বাঙ্গলায় পুরুষশক্তি মেরুদণ্ডহীন, কুব্জ। বাঙ্গলার লক্ষ্মীশ্রী পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া ড্রয়িংরুমবীরের কম্প্লিমেণ্ট-প্রত্যাশী। অবশ্য, সমস্ত দেশটার পুরুষ ও নারীশক্তির এত বড় দুর্গতি হইয়াছে, এমন মিথ্যাকথা আমরা বলি না। তবে বাঙ্গলাদেশের একটা বড় অংশের পুরুষ ও নারীশক্তির মধ্যে এমনি একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা খুব সত্য। এই অংশে বিদ্যা থাকিতে পারে, বুদ্ধি থাকিতে পারে, অর্থও কিছু থাকিতে পারে,—কিন্তু যদি ফেরঙ্গানুকরণশীল বাঙ্গালীর এই অংশ শীঘ্র আত্মস্থ না হয়, এবং বিলাতী রকম-বেরকম পার্টিগুলির নিষ্ফল অভিনয় পরিত্যাগ না করে, তবে বিষাক্ত অঙ্গের মত সমাজ-শরীর এই অংশকে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া পারিবে না। অক্ষয়কুমার বিলাতী পার্টি অনুকরণকারী সমাজের মধ্যে বিশেষ যাতায়াত করেন নাই। এ দিকে তাঁহার পদ-বিক্ষেপ যথেষ্ট সংযত ছিল; এবং তাহা ছিল বলিয়াই তাঁহার মৃত্যুর পর হালফ্যাসানের শোকপ্রকাশ বড় একটা হইয়া উঠিল না। ইহাতে আমরা দুঃখিত নই; বরং আশ্বস্তি বোধ করিতেছি।

যে লঘুচিত্ত তরুণী আমাদের গৃহধর্ম্মের সংযত নিষ্ঠাকে উপেক্ষা করিয়া এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দেশের একটা ভাষাহীন সম্মান হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া,—ড্রয়িংরুমের সভ্যবেশ-ধারী কতিপয় বিলাতী ধরণের ইয়ার-বন্ধুর কম্প্লিমেণ্ট ও করতালির জন্য পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া হাস্য করেন, তিনি সম্ভবতঃ খুব ভাল কার্য্য করেন না। এখনকার ড্রয়িংরুমে ব্লাউচ-আঁটা তরুণীর যে স্থান ও সম্মান, আমাদের দুঃখদারিদ্র্যের গৃহস্থালীতে তাঁহাদের

স্থান ও সম্মান তাহা অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধেই ছিল। হয় ত আমরা সর্ব্বাংশেই ভাল ছিলাম না ও ভাল নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সর্ব্বাংশেই মন্দ হইব কেন? বাঙ্গলার অনেক পুরুষ এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সমধর্ম্মী। ড্রয়িংরুমের করতালি না হইলে তাঁহারা বাঁচেন না। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এই শ্রেণীর লঘুচিত্ত স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি ড্রয়িংরুমেরও জীব ছিলেন না। পার্টিতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। ধর্ম্ম বা সমাজসংস্কারের সভাকে তিনি সভয়ে পরিহার করিতেন। এতগুলি দোষ তাঁহাতে ছিল। কাজেই ড্রয়িংরুম-বিলাসী ও বিলাসিনীরা মৃত্যুর পর তাঁহার কথা আজ ভাবিবার অবসর বেশী পাইলেন না। কিন্তু এ দিন বাঙ্গলায় চিরদিন থাকিবে না। একদিন আসিবে—যে দিন বাঙ্গালী অক্ষয়কুমারকে স্মরণ করিয়া বলিবে—

"সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগত নশ্বর,—
কবিতা অমৃত,—আর কবিরা অমর।"

শ্রীঃ—

নারায়ণ

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৬ সাল।

আগমনী

বাঙ্গলার প্রাচীন গান

(১)

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
সে যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল ॥
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী হোল ॥

(২)

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা কেমন রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদ-বচনে,
মা, মা, ব'লে উমা কেন্দেছে ॥
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গড় পীরিতি বড়,
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়,

ভাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর,
উমারে কত কি করেছে ॥
উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ,
তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে ॥

(৩)

শরৎকালে রাণী বলে বিনয়-বচন।
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন ॥
মায়া করি গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি।
মা বলিয়া কাঁদ্‌লো কত মোর নিকটে বসি ॥

* * * *

বৎসর কত হলো গত কর্‌ছে হরের ঘর।
চল গিরি আন্‌তে গৌরী কৈলাস-শিখর ॥

(৪)

হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণি।
স্বপনের কথায় কেন হোচ্ছ পাগলিনী ॥

* * * *

সেই জামাতা পাগল বেটা পর্‌ছে বাঘের ছাল।
বম্‌ বম্‌ বম্‌ কর্‌ছে সদা বাদ্য ক'রে গাল ॥

* * * *

ইচ্ছা যদি থাকে তোর মর্‌ছিস্‌ কেন দুঃখে।
যা কৈলাসে মেয়ের কাছে থাক্‌বি গিয়ে সুখে ॥

* * * *

গত বৎসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি।
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামাতার বাড়ী ॥

(৫)

রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া।
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া ॥

* * * *

সে যে দেবদেব মহাদেব বসে সর্ব্বঘটে।
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন দেবতার জটে॥
* * * *
সেই জামাতার নিন্দা-কথা কখনো না বলো!
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হ'লো॥

(৬)

গিরি বলে এবার গেলে আস্‌বো বিরূপ হয়ে।
যা'হক তা'হক যাব কোন দ্রব্য লয়ে॥
* * * *
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার।
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার।

(৭)

* * * *
দেব-সভাতে প্রণাম লয়ে বস্‌লেন হিমালয়॥
গুটি পাঁচ সাত সিদ্ধি-বড়ী মহাদেবকে দিলেন।
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন॥

(৮)

নিজ পুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল।
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল॥
* * * *
ক'ও গো বাবা কত কথা সে সকল শুন্‌ব পাছে।
সত্য ক'রে বল বাবা মা কেমনে আছে॥
* * * *
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে।
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী—তুষ্ট হলেন তাতে॥
যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা।
শ্বশুরে জামাতায় তাহে ভোজনে বসিলা॥
বাপকে বসিতে দিল রত্ন-সিংহাসন।
শিবকে বসিতে দিল ভাঙ্গা কুশাসন॥